গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৫ বর্ষ ৩৫ সংখ্যা ১৮ এপ্রিল ২০০৩ | প্রধান সম্পাদক ঃ সুকোমল দাশগুপ্ত | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

ইরাকের দেশপ্রেমিক বীর জনগণকে অভিনন্দন

এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটি

মার্কিন-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকারীদের দ্বারা গত ৯ এপ্রিল বাগদাদ ও অন্যান্য কয়েকটি ইরাকি অঞ্চল দখলের ঘটনায় তীব্র ধিক্কার জানিয়ে এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ১১ এপ্রিল নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়েছেন—

"একথা গভীর বেদনা ও উদ্বেগের যে, অত্যন্ত শক্তিশালী অত্যাধুনিক গণমারণাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আক্রমণকারী মার্কিন ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা, ইরাক আক্রমণের বিরুদ্ধে অভূতপূর্ব তীব্র বিশ্বজনমতকে পদদলিত করে, সমস্ত আন্তর্জাতিক আইন কানুন, রাষ্ট্রসংঘের সনদ ও নিরাপত্তা পরিষদের সুস্পষ্ট মতামতকে নগ্নভাবে লংঘন করে এবং বীর দেশপ্রেমী ইরাকি জনগণ হাজার একটা প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে একা লড়াই করে দীর্ঘ একুশ দিন ধরে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যে দৃঢ় বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল, তাকে ভেঙে গত ৯ এপ্রিল বাগদাদে প্রবেশ করতে সক্ষম হল এবং ইরাকি জনগণের উপর অবর্ণনীয় নিষ্ঠুর আক্রমণ চালানোর পর এই শহর আপাতত দখল করল। বর্তমান কালের সর্বাপেক্ষা হিংস্র ফ্যাসিস্ট সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের বিরুদ্ধে যেভাবে নির্ভীক চিত্তে মাতৃভূমি রক্ষার ন্যায়যুদ্ধ তারা চালিয়েছেন, সেজন্য আমাদের দলের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে ইরাকের বীর যোদ্ধা ও বীর জনগণকে আমরা অভিনন্দন জানাই। আমাদের দল দৃঢ়ভাবে মনে করে যে, এই অসমসাহসী প্রতিরোধ নিশ্চিতভাবেই সমগ্র দুনিয়ার মানুষকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের আধিপত্যবাদ ও প্রভুত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সাহস জোগাবে। তাই এই যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের ইতিহাসে এক নতুন গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় যোগ করল।

কেন্দ্রীয় কমিটি নিঃসংশয়ে মনে করে যে, পাশবিক শক্তি আর ভয়াবহ মারণাস্ত্র প্রয়োগ করে সাম্রাজ্যবাদীরা দেশের এক-আধটা ভূখণ্ডের দখল নিতে পারল বলে একথা ভেবে নেওয়া ঠিক নয় যে, ইরাকি জনগণের মনে জ্বলন্ত দেশপ্রেম ও স্বাধীনতাস্পৃহা চিরতরে নিভে গেল, তাদের প্রতিরোধ-স্পর্ধা বরাবরের জন্য হার মানল। কিংবা স্বাধীনতাপ্রিয় ইরাকি জনগণকে দমিয়ে দিতে সাম্রাজ্যবাদীরা সফল হয়ে গেল। বরং আমাদের দল দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, ইঙ্গ-মার্কিন আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে নিজেদের মাতৃভূমি ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার জন্য ইরাকি জনগণের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ সংগ্রাম অচিরেই এক অত্যন্ত শক্তিশালী স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপ নেবে এবং অতি দ্রুত তাদের দেশের মাটি থেকে আক্রমণকারীদের তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হবে।

আমাদের দেশ ও সমগ্র বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষের কাছে আমরা আবেদন করছি ঃ ইরাকি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবনের এই গভীর সঙ্কটের সময় দৃঢ়ভাবে তাদের পাশে দাঁড়ান, তাদের স্বাধীনতার লড়াইকে নিজেদের লড়াই বলে মনে করুন এবং এই পথে এমন এক শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলুন যা আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে কার্যত এক দ্বিতীয় ফ্রন্ট গড়ে তুলবে।

এদেশের মানুষের কাছে আমরা আবারও আহবান জানাই — ইঙ্গ-মার্কিন পণ্য বয়কটের আন্দোলনকে তীব্রতর করুন যাতে তা অবিলম্বে ইরাক ছাড়ার জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের উপর তীব্রতর চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

পেপসি কোকাকোলা সহ মার্কিন-ব্রিটিশ পণ্য বয়কট করুন

মহান ২৪ এপ্রিলের আহ্বান

২৪শে এপ্রিল এদেশের সর্বহারাশ্রেণীর প্রিয় দল এস ইউ সি আই-এর ৫৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস। এদেশের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির মাত্র অল্প কয়েকমাস পরেই ১৯৪৮ সালের এই দিনটিতে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ এই দলটির প্রতিষ্ঠা করেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষায় এদেশে যে স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, এদেশের আপামর জনসাধারণের আশা ছিল স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর সমাজের সর্বাঙ্গীন বিকাশের দ্বার উন্মুক্ত হবে, মানুষের দ্বারা মানুষের সর্বপ্রকার শোষণের অবসান ঘটবে এবং জনসাধারণের জীবনে সুস্থভাবে খেয়ে পরে বেঁচে থাকার একটি ব্যবস্থা হবে। কিন্তু তৎকালীন সময়ে দেশে একটি যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টির অনুপস্থিতিতে স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে চলে যাওয়ার ফলে এই স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে জনগণের আকাঙ্ক্ষিত শোষণমুক্তি যে ঘটতে পারে না, কমরেড শিবদাস ঘোষের চেতনায় এই উপলব্ধি প্রতিভাত হয়েছিল।

সেইসময় কমিউনিস্ট নামে পরিচিত অবিভক্ত সি পি আই (যা আজ সি পি আই, সি পি আই(এম), সি পি আই (এম-এল)-এর নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত) জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রকৃত কমিউনিস্টদের যে ভূমিকা পালন করার কথা তা পালন তো করেইনি, বরং গোটা স্বাধীনতা আন্দোলনে তাদের ভূমিকা জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বকেই সংহত হতে সাহায্য করেছে এবং এর মধ্য দিয়ে কমিউনিজমের মহত্ত্বকেই তারা জনমানসে হেয় প্রতিপন্ন করেছে। ফলে স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের পরিবর্তে এদেশে বুর্জোয়া শাসন ও শোষণব্যবস্থা কায়েম হয়েছে। এই অবস্থায় ঐতিহাসিক নিয়মেই সর্বপ্রকার শোষণের অবসানের জন্য এদেশের শোষিত জনগণকে নতুন করে আবার একটি বিপ্লব সংঘটিত করার দিকে যেতে হবে এবং সেই বিপ্লব হবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। অথচ দেশে একটি যথার্থ সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী দল ছাড়া এই বিপ্লব কোনমতেই হতে পারেনা। মার্কসবাদের এই শিক্ষা থেকেই কমরেড শিবদাস ঘোষের কাছে এদেশে নতুন করে একটি সত্যিকারের সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী দল গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য কর্তব্য হিসাবে দেখা দেয়। কিন্তু প্রয়োজনের উপলব্ধি এক জিনিস, আর সেই উপলব্ধিকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক প্রস্তুতি গড়ে তোলা অনেক বেশি কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ এবং এইখানেই নিহিত রয়েছে কমরেড শিবদাস ঘোষের অনন্যসাধারণ সংগ্রাম।

চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল ও অবক্ষয়িত ব্যক্তিবাদের যুগে কমরেড শিবদাস ঘোষ এদেশে একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের কমিউনিস্ট দল

আটের পাতায় দেখুন

পেপসি কোকাকোলার বিজ্ঞাপন বন্ধ কর

১২ এপ্রিল কলকাতা দূরদর্শন ভবনের সামনে বিক্ষোভ। পেপসি-কোকাকোলার বিজ্ঞাপন প্রচার বন্ধের দাবিতে অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি-ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরামের পক্ষ থেকে স্টেশন ডিরেকটরের হাতে স্মারকলিপি পেশ করা হয়। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন বিজ্ঞানী সুজয় বসু।

কমরেড আশুতোষ ব্যানার্জীর অবস্থা সঙ্কটজনক

এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড আশুতোষ ব্যানার্জী দুরারোগ্য জটিল নিউমোনিয়া ও জণ্ডিসে আক্রান্ত হয়ে গত ১৮ মার্চ, ২০০৩ ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যাণ্ড হসপিটালে ভর্তি হন। অধ্যাপক ডাঃ এন কে মজুমদার, অধ্যাপক ডাঃ এস সি দে, ডাঃ শুশ্রুত বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ পার্থসারথি ভট্টাচার্য, ডঃ সঞ্জয় ঘোষ, ডাঃ সুনন্দ অধিকারী প্রমুখ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যাণ্ড হসপিটালের ডাক্তার ও নার্সদের একটি টিম তাঁর চিকিৎসা পরিচালনা করেন।

প্রথমদিকে শ্বাসপ্রশ্বাস প্রক্রিয়া স্বাভাবিক রাখার জন্য যন্ত্রের সাহায্যের প্রয়োজন হলেও অল্প কয়েকদিনের মধ্যেও তাঁর অবস্থার লক্ষণীয় উন্নতি ঘটে এবং কৃত্রিম শ্বাসপ্রক্রিয়ার যন্ত্র তুলে নেওয়া হয়। কিন্তু ২৯ মার্চ পুনরায় তাঁর অবস্থার অবনতি ঘটতে শুরু করে। শ্বাসকষ্ট পুনরায় শুরু হয় এবং ৩১ মার্চ রাত থেকে হঠাৎ তা তীব্র আকার ধারণ করে। ১ এপ্রিল সকালে খুবই আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে 'সুরক্ষা' হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় এবং শ্বাসকষ্টের তীব্রতার জন্য তাঁকে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়।

সর্বশেষ সংবাদ পর্যন্ত তাঁকে এখনও ভেন্টিলেশনেই রাখা আছে। তাঁর অবস্থা খুবই সঙ্কটজনক।

যুদ্ধবিরোধী কনভেনশন থেকে মার্কিন-ব্রিটিশ পণ্য বয়কটের আহ্বান

সারা ভারত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফোরামের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির আহবানে ৮ এপ্রিল কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত যুদ্ধবিরোধী কনভেনশনে গৃহীত প্রস্তাবে ইরাকের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের উপর মার্কিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের তীব্র নিন্দা করা হয় এবং যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনকে কার্যকরী ও তীব্রতর রূপ দেওয়ার জন্য পেপসি-কোকাকোলা সহ মার্কিন-ব্রিটিশ পণ্য বর্জন করার আহবান জানানো হয়। কনভেনশনে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা ও বিভিন্ন বামপন্থী দলের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন ফোরামের রাজ্য শাখার সভাপতি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সুনন্দ সান্যাল। সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায় ও অন্যতম সহসভাপতি মানিক মুখোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়।

ডঃ সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, আমরা ভারতবাসীরা সাম্রাজ্যবাদী শাসন শোষণ দেখেছি। আজ ইরাকে আমেরিকা ও ব্রিটেন যে হিংস্রতা দেখাচ্ছে, তা বন্যজন্তুর চেয়েও ভয়ঙ্কর। এর পক্ষে কোনও যুক্তি নেই, এ নিছকই অস্ত্রের জোরে অপর দেশের স্বাধীনতা হরণ করা। আমাদের অস্ত্র নেই, মিলিটারি নেই, যা দিয়ে আমরা একে প্রতিরোধ করতে পারি। তবে একটা কাজ আমরা করতে পারি, যা দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের উপর কিছুটা আর্থিক চাপ তৈরি করা যায়, তাহল, ওদের কোম্পানির তৈরি পণ্য আমরা ব্যবহার করব না। কেউ কেউ এর বিরুদ্ধতা করে বলেছেন, এর ফলে কিছু মানুষের ক্ষতি হবে। আমরা বলি, একটা বড় কাজের জন্য অনেক সময় কিছু আত্মত্যাগ করতে হয়। আশা করব, মানুষ এতে সাড়া দেবেন।

প্রখ্যাত নাট্যপরিচালক রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত বলেন, মার্কিন সংস্কৃতি আজ আমাদের ঘরে ঘরে ঢুকে গেছে, ভোগবাদের শিকার হয়েছে বর্তমান প্রজন্ম। ফলে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইটা আমাদের শুরু করতে হবে নিজেদের ঘর থেকে। এতকাল আমরা ভেবেই দেখিনি যে, আমাদের দেশের নিজস্ব ঠাণ্ডা পানীয়ই নেই, সব ওদের দখলে। ভাঙচুর করে নয়, জনমত গড়ে তুলে পেপসি-কোক বয়কট আন্দোলন চালাতে হবে।

অধ্যাপক জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় বলেন, বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়নের থাকা ও না থাকার মধ্যে কী বিশাল পার্থক্য, তা আমরা বুঝতে পারছি। ৩০ মার্চ বামপন্থী দলগুলোর ঐক্যবদ্ধ যুদ্ধবিরোধী মিছিলে ডাক্তারের নিষেধ সত্ত্বেও আমি হেঁটেছি, স্বস্তি পেয়েছি। আমি নিশ্চিত যে, সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের অন্ধকারই শেষ কথা নয়, এরপরে আলো আছেই।

বিজ্ঞানী সমর বাগচি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের সরকারি দল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠভাবে দাঁড়াতে পারল না। কারণ, বিশ্বব্যাঙ্কের কাছ থেকে, জাপান-আমেরিকা-ব্রিটেনের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে উন্নয়নের মডেল করব, আবার সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধতা করব, এ দুটো একসাথে হয়না। পেপসি-কোকাকোলা পানীয় তৈরির জন্য মাটির তলা থেকে ব্যাপক জল টেনে নিচ্ছে, যার দ্বারা জলভাণ্ডার শুকিয়ে যাচ্ছে, এদিকটাতেও জোর দেওয়া দরকার। বয়কটের আহবান ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তিনি কিছু প্রস্তাব রাখেন।

এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক প্রভাস ঘোষ বক্তব্য রাখেন, যা অন্যত্র প্রকাশ করা হল।

অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন, বিচারপতি অবনীমোহন সিন্‌হা, বিজ্ঞানী সুজয় বসু, কলকাতার বসরাভি মসজিদের ইমাম মৌলানা আলতাফ আববাস রিজভি, সাংবাদিক-লেখক গীতেশ শর্মা, চিত্রাভিনেতা স্বরূপ দত্ত, সাংবাদিক সৈয়দ আলি, স্বাধীনতা সংগ্রামী বিভাস রায়। বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষে বক্তব্য রাখেন সন্তোষ রাণা (সি পি আই-এম এল), সুব্রত বসু (সি ও আই-এম এল), অভিজিৎ মজুমদার (সি পি আই-এম এল), অসীম চ্যাটার্জী (সি আর এল আই) এবং কালিপদ ঘোষ (বলশেভিক পার্টি)।

পেপসি-কোকাকোলা সহ মার্কিন-ব্রিটিশ পণ্য বয়কট আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে সম্মেলনে বার্তা পাঠিয়ে ছিলেন কবি শঙ্খ ঘোষ ও সাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ।

"ইরাকিদের মুখে হাসি, চোখে নেই"

★ "একদল ইরাকিকে দেখিয়ে মার্কিন ১০১ এয়ারবোর্ন ডিভিশনের এক সেনার মন্তব্য, ওদের মুখে হাসি থাকলেও চোখে কিন্তু হাসির লেশ নেই।" *আনন্দবাজার, ১৪ এপ্রিল ২০০৩*

★ "তবে বাগদাদে যে সব লোকজনকে টি ভি-তে উদ্দাম নৃত্য করতে দেখা যাচ্ছে, তারা রাজধানীর জনসংখ্যার মাত্র ১০ শতাংশ। ৯০ শতাংশ বাগদাদবাসী গত দুদিন ধরে বাড়ি থেকে বেরোচ্ছেন না।" *প্রতিদিন, ১১ এপ্রিল ২০০৩*

★ "টি ভি'র ছবি দিয়ে যে কোনভাবে বিচার করলে দেখা যাবে ইরাকিরা উল্লাস প্রকাশ করার চাইতে লুঠ করতে বেশী ব্যস্ত। ৫০ লক্ষ মানুষের এক শহরে কয়েক হাজার মানুষের এই ধরনের কাজ থেকে খুব বেশী কিছু প্রমাণ হয় না।" *সম্পাদকীয়, হিন্দুস্থান টাইমস, ১৩ এপ্রিল, ২০০৩*

★ "কিন্তু এই মানুষগুলো কি বেশীরভাগ ইরাকিদের প্রতিনিধিত্ব করছে? আমেরিকা বাগদাদ দখল করে নেওয়ায় সমস্ত শিয়ারাই কি উল্লসিত?" *সম্পাদকীয়, হিন্দুস্থান টাইমস, ১৩ এপ্রিল, ২০০৩*

"এখনও জোট সেনার ব্যর্থতা মূলত তিনটি। প্রথমত, যে অভিযোগ তুলে যুদ্ধটা শুরু করা হল, দীর্ঘ তিন সপ্তাহ যুদ্ধ চালিয়েও বুশ বা ব্লেয়ার প্রমাণ করতে পারেননি, সাদ্দাম সত্যিই ইরাকের কোথাও রাসায়নিক, জৈব বা পরমাণু অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছেন।
দ্বিতীয়ত, বিশাল অস্ত্রসম্ভার নিয়েও যৌথবাহিনী দ্রুত ইরাককে দখলে আনতে পারেনি। এখনও দেশের নানা প্রান্তে প্রতিরোধ চলছে। তা কবে পুরোপুরি শেষ হয়ে যাবে, যৌথবাহিনীর কর্তারাও জানেন না।
তৃতীয়ত, সাদ্দামকে পাওয়া যায়নি। বাধ্য হয়ে তার মূর্তি ভেঙে, ভাঙা মূর্তিতে লাথি মেরেই বিরোধীদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে।
রাজীব সাহা, বর্তমান ১৩-৪-০৩

ন্যায্যদামে আলু কেনার দাবিতে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা শাসক অফিসে বিক্ষোভ

এস ইউ সি আই-এর ডাকে গত ৩১ মার্চ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা শাসকের অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয় আলু চাষিদের সমস্যা সমাধানের দাবিতে। সেখানে বক্তব্য রাখেন কমরেডস্ পঞ্চানন প্রধান, অমল মাইতি, প্রাণতোষ মাইতি প্রমুখ। অতিরিক্ত জেলা শাসক (সাধারণ) ডেপুটেশন গ্রহণ করেন।

দলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় — (১) আলুর উপযুক্ত দাম সরকারকে নির্ধারণ করতে হবে, (২) অভাবি বিক্রির সুযোগ নিয়ে চাষিদের ঠকানো চলবে না, (৩) চন্দ্রকোনায় আত্মহননকারী আলুচাষি শিবহরি চৌধুরীর পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, (৪) চাষিদের ফসলের ন্যায্য দাম এবং ক্রেতাদের ন্যায্য দামে খাদ্যশস্য পাওয়া নিশ্চিত করতে ও বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য খাদ্যশস্যে সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করতে হবে, (৫) ন্যায্য মূল্যে আলু কেনার জন্য অঞ্চলে সরকারি কেন্দ্র খুলতে হবে, (৬) সহজ শর্তে হিমঘরে আলু রাখার ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে।

দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে এ ডি এম বলেন, সরকার এখনো উল্লেখযোগ্য কোন নির্দেশ না দেওয়ায় কিছুই করা যাচ্ছে না। প্রতিনিধিরা জানান, ২/১ দিনের মধ্যে আলু সরকারিভাবে কেনা শুরু না হলে ডি এম অফিস ঘেরাও হবে।

ছাত্রী হত্যার প্রতিবাদে ডি এস ও'র বিক্ষোভ

গত ৩ এপ্রিল উত্তর ২৪ পরগণার দেগঙ্গা থানার ফাজিলপুর গ্রামের মকসেদুর রহমানের কন্যা, বিরাটির মৃণালিনী দত্ত কলেজের বি.এ প্রথম বর্ষের ছাত্রী জাহানারা খাতুনকে একদল দুষ্কৃতী ধর্ষণ করে নৃশংসভাবে খুন করে। সারা ভারত ডি এস ও'র এক প্রতিনিধি দল ঘটনাস্থলে যান। ঘটনার পরদিনই উত্তর ২৪ পরগণা জেলার ডি এস ও'র সভাপতি কমরেড স্বপন মণ্ডলের নেতৃত্বে প্রতিনিধিরা দেগঙ্গা থানায় এবং বারাসাত এস ডি পি ও'কে ডেপুটেশন দেন। তাঁরা দাবি করেন (১) সমস্ত দুষ্কৃতীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। (২) জাহানারার পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

৫ এপ্রিল এই মর্মান্তিক নিষ্ঠুর ঘটনাকে ধিক্কার জানিয়ে এবং অপরাধীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে দেগঙ্গা ব্লকের বিভিন্ন স্থানে মিছিল ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিবাদসভায় উপস্থিত স্থানীয় মানুষেরা দুষ্কৃতীদমনে সরকারি ব্যর্থতার বিরুদ্ধে ধিক্কারে ফেটে পড়েন।

অঙ্গদবেড়িয়ায় মহিলা সম্মেলন

মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে ১২ মার্চ দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানিং থানার অঙ্গদবেড়িয়া অঞ্চল মহিলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে। সম্মেলন পরিচালনা করেন পঞ্চায়েত সদস্যা কমরেড জয়ন্তী মণ্ডল। সম্মেলনে প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদিকা কমরেড দীপ্তি সরকার। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা কমিটির সদস্যা কমরেড পুষ্প পুরকাইত ও এস ইউ সি আই ক্যানিং থানার অন্যতম নেতা কমরেড বাদল সরদার।

সম্মেলনের উদ্বোধন করেন এম এস এস-এর জেলা কমিটির অন্যতম সদস্যা কমরেড পুষ্প পাল। মূল প্রস্তাব পাঠ করেন কমরেড কল্পনা সরদার। ধানতলা ও ঘোকসাডাঙ্গায় নারীধর্ষণ ও অত্যাচারের প্রতিবাদে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন কমরেড মমতাজ মণ্ডল। দুটি প্রস্তাবের উপর প্রতিনিধিরা আলোচনা করেন ও সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়। প্রধান বক্তা জেলা সম্পাদিকা কমরেড দীপ্তি সরকার তাঁর আলোচনায় নারীজীবনের সমস্যা, নারী নির্যাতন প্রতিরোধে মা-বোনেদের ভূমিকা এবং নারীমুক্তির পথনির্দেশ তুলে ধরেন।

সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে কমরেড জয়ন্তী মণ্ডলকে সভানেত্রী ও কল্পনা সরদারকে সম্পাদিকা করে ১৫ জনের আঞ্চলিক কমিটি গঠন করা হয়। মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীত গেয়ে সম্মেলনের সমাপ্তি হয়।

কান্দীতে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের কনভেনশন

গত ৬ এপ্রিল মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী পৌরসদন হলে দ্বিতীয় বিদ্যুৎ গ্রাহক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। ছয় দফা দাবি সম্বলিত প্রস্তাব উত্থাপন করেন অজয় রায়। ছোট মিল মালিক, কৃষি গ্রাহক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সহ গৃহস্থ প্রতিনিধিরা নানান সমস্যা, বিশেষ করে জোর পূর্বক অ্যাডিশনাল সিকিউরিটি চার্জ আদায়ের কথা তুলে ধরেন। কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন রাজা বীরেন্দ্র চন্দ্র কলেজ অব কমার্সের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মনোরঞ্জন ঘোষ। প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি শ্যামলেশ চট্টোপাধ্যায়, শিল্পী নিকেতনের পঞ্চানন দাস, সরকারি কর্মচারী জয়ন্ত ভট্টাচার্য, জেলা প্রতিনিধি গৌতম সাহা ও সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির জেলা সম্পাদক কুনাল বিশ্বাস প্রমুখ। কান্দী বান্ধব পত্রিকার কর্ণধার নবকুমার মুখোপাধ্যায়কে সভাপতি ও মানব ত্রিবেদীকে সম্পাদক করে নয় সদস্যের একটি কমিটি গঠিত হয়। ইতিমধ্যে গত ২৭ মার্চ বিক্ষোভ ডেপুটেশন এর চাপে স্থানীয় এস এস এ্যাডিশনাল সিকিউরিটি চার্জ আদায়ের সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখেন।

সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির সাথে আপস করে যুদ্ধ ঠেকানো যায়না

যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরাকের শাসন ও পুনর্গঠনে মূল ভূমিকা কাদের হবে তা নিয়ে আমেরিকার সাথে ব্রিটেন সহ ইউরোপীয় দেশগুলির প্রবল দ্বন্দ্ব ইতিমধ্যেই সামনে চলে এসেছে। ইরাকের জনগণ কর্তৃক ধিক্কৃত, অবাঞ্ছিত দখলদার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের শিরোমণি জর্জ বুশ আগেই পরিষ্কার বলেছেন ইরাকে যুদ্ধ পরবর্তী পুনর্গঠনে প্রধান ভূমিকা নেবে আমেরিকা, রাষ্ট্রসংঘ নয়। অন্যদিকে ফ্রান্স, জার্মানি, রাশিয়ার সরকার শুধু নয়, মার্কিনদোসর ব্রিটিশ সরকারও চাইছে রাষ্ট্রসংঘই একাজে প্রধান ভূমিকা নিক।

বলা বাহুল্য, এই টানাপোড়েন, চাপান উতোরের পিছনে রয়েছে মুনাফার স্বার্থ। পুনর্গঠনের কাজ মার্কিন নিয়ন্ত্রণে হলে আমেরিকার ইচ্ছা অনুযায়ীই সবকিছু হবে এবং স্বভাবতই সেক্ষেত্রে মার্কিন কোম্পানিগুলিই পুরো লাভটা টেনে নেবে, অন্যেরা বঞ্চিত হবে বা মার্কিন অনুগ্রহে ছিটেফোঁটা পাবে। কিন্তু আমেরিকা না হয়ে যদি রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকা প্রধান হয় তবে সকলেরই আশা সেক্ষেত্রে অন্যান্যদের ভাগ তুলনামূলকভাবে খানিকটা বেশি হওয়ার সম্ভাবনা। তাই যুদ্ধসঙ্গী ব্রিটিশ সরকারও চাইছে পুনর্গঠনের মুখ্য ভূমিকা থাক রাষ্ট্রসংঘের হাতে।

ইরাক পুনর্গঠন থেকে সবচেয়ে বেশি ফয়দা কে তুলবে, তা নিয়ে বহু চাপাচাপির শেষে উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের হিলসবরো বৈঠকের পর বুশ এইটুকু মেনেছেন যে রাষ্ট্রসংঘ এ ব্যাপারে 'গুরুত্বপূর্ণ' ভূমিকা নেবে। এই 'গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা' বলতে কি বোঝায়? বুশ বলেছেন 'খাদ্য, ওষুধ, সাহায্য ও ত্রাণ বণ্টনে' রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকা হবে গুরুত্বপূর্ণ। এর অর্থ হচ্ছে বাকী সমস্ত ব্যাপারে মার্কিন ভূমিকাই হবে প্রধান এবং হাজার হাজার কোটি ডলারের পুনর্নির্মাণের পুরো কর্তৃত্ব থাকবে মার্কিন শাসকদেরই হাতে। এছাড়া এমন কথাও উঠছে যে ইরাক যুদ্ধের যারা বিরোধিতা করেছে ইরাক পুনর্গঠনের কোন বরাত তাদের দেওয়া হবে না।

আসলে বুশ প্রশাসনের এছাড়া অন্য কোন উপায়ও নেই। কারণ, মার্কিন কর্পোরেট হাউসগুলিকে সন্তুষ্ট করেই এবং তাদের সম্মতি নিয়েই তাদের যা কিছু করতে হবে। এ ব্যাপারে শুধু আমেরিকাই নয়, তীব্র আর্থিক সংকটে জর্জরিত প্রতিটি সাম্রাজ্যবাদী দেশের শাসকদলই আপন আপন দেশের কর্পোরেটদের স্বার্থে এই ভাগ পাওয়ার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছে এবং তা নিয়েই এদের মধ্যে তীব্র বিরোধ দেখা দিয়েছে। এর সাথে জনস্বার্থের কোন সম্পর্ক নেই। এই কর্পোরেট হাউসগুলির অর্থ-সামর্থ্যের বলেই এই দলগুলি ক্ষমতায় আসীন হয়েছে এবং টিকে রয়েছে। তাই দেখা যায়, এই মতভেদের ফয়সালা হওয়ার আগেই পুনর্নির্মাণের ৬০ কোটি ডলারের ঠিকাদারি ৫টি মার্কিন কোম্পানিকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই পাঁচটি কোম্পানি গত তিন বছরে একত্রে দু কোটি আশি লক্ষ ডলার রাজনৈতিক দলগুলিকে অনুদান হিসাবে দিয়েছে। এই টাকার বেশিরভাগ গিয়েছে বুশের রিপাবলিকান পার্টির খাতায় (সূত্র ঃ আনন্দবাজার ৪-৪-০৩)।

ইরাকের উপর অন্যায় আক্রমণ ও দখলদারির বিরুদ্ধে আমেরিকায় গণবিক্ষোভ। ১২ এপ্রিল, ওয়াশিংটন।

আমাদের দল আগেই বলেছিল, সাম্রাজ্যবাদী ফ্রান্স, জার্মানি ও রাশিয়ার যুদ্ধবিরোধিতার পিছনে রয়েছে তাদের নিজ নিজ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ। এখন মার্কিন দস্যুরা ইরাক দখল করার পর তারাও যুদ্ধ পরবর্তী লুটের ভাগ নিতে তৎপর হয়ে উঠেছে। ফ্রান্স, জার্মানি ও রাশিয়ার প্রধান লক্ষ্য হল আপস আলোচনা ও চাপাচাপির রাজনীতির মধ্য দিয়ে ইরাক লুটের ভাগ পাওয়া। তাই আগে তারা যাই বিরোধিতা করে থাকুক এখন যুদ্ধ শেষ হওয়ার মুখে "ইরাকে শাসক পাল্টানো খুবই দরকার ছিল" (জার্মান বিদেশমন্ত্রী), "মধ্যপ্রাচ্যে স্থিতি আনতে রাষ্ট্রসংঘের মাধ্যমে আমেরিকার সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করা দরকার" (ফরাসি প্রধানমন্ত্রী), "ইরাকে আমেরিকার হারলে চলবে না, তাহলে রাশিয়ার ক্ষতি হবে" (রুশ প্রধানমন্ত্রী) — এইসব কথা বলে তাঁরা মার্কিন বর্বরতাকে কার্যত স্বীকৃতি দিচ্ছেন।

২ এপ্রিল ঢাকায় বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) যুদ্ধবিরোধী বিশাল মিছিল

সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিপর্যয়ের পর সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে বাধাদানের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ায় বিশ্বপরিস্থিতি যে যুদ্ধের অনুকূলে ঢলে পড়েছে — কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে এ কথা আমাদের দলের '৯৪ সালের প্লেনামেই বলা হয়েছিল। বস্তুত, '৯১ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধের পর থেকে একের পর এক যুদ্ধের বিরাম নেই। বিশ্বসাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি প্রবল অর্থনৈতিক সংকট থেকে বাঁচার মরিয়া প্রচেষ্টায় একে অপরের আধিপত্যের এলাকায় ভাগ বসাতে চাইছে। কার্ল মার্কস বহুদিন আগেই দেখিয়েছিলেন, পুঁজি যেমন মুনাফার স্বার্থে বিশ্বের দেশে দেশে ঘাঁটি গড়ে তোলে, তেমনি অপর দেশের পুঁজিকে কাঁচা মালের উৎস থেকে বঞ্চিত করার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা চালায়। ইরাকের তথা পশ্চিম এশিয়ার তেল নিজে দখল করার দ্বারা বিশ্বব্যাপী তেলের বাজার নিয়ন্ত্রণ করা এবং জার্মানি ফ্রান্স রাশিয়া সহ অন্যান্য পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিকে তা থেকে বঞ্চিত করার মার্কিন চেষ্টা মার্কসের বিশ্লেষণের সত্যতাকেই আবারও প্রমাণ করেছে।

ইরাকের ঘটনাবলী থেকে পরিষ্কার বেরিয়ে এসেছে যে, সাদ্দাম হোসেনের হাতে গণবিধ্বংসী অস্ত্র মজুতের আমেরিকার মিথ্যা বাহানার আসল লক্ষ্য ছিল ইরাক সরকারের বদল ঘটানো এবং নিজেদের পছন্দ মত দালাল সরকার বসিয়ে সেখানে আধিপত্য কায়েম করা। একটা অন্যায় যুদ্ধে বর্বর শক্তি জয়ী হওয়ার দ্বারা সাম্রাজ্যবাদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সাময়িকভাবে মেটানোর চেষ্টা হলেও তা প্রশমিত হয় না। যে মূল সঙ্কট থেকে এই দ্বন্দ্বের উদ্ভব তা সংকট বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাড়তেই থাকে। যুদ্ধ পরবর্তী জোড়াতালি, আপস আবার একটা যুদ্ধ হওয়াকে ঠেকাতে পারে না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘটেছিল সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশ ভাগাভাগির দ্বন্দ্ব থেকে। সেই যুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন-ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের হাতে অটোমান তুর্কি সাম্রাজ্যের পরাজয়ের পর ইরাক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবজায় আসে। ইরাকি তৈলসম্পদ দখলই ছিল ব্রিটিশের লক্ষ্য। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেন ও ফ্রান্স মিত্রপক্ষের শরিক হিসাবে যুদ্ধে জয়ী হলেও দুনিয়ার ওপর তাদের পুরনো আধিপত্য বহুলাংশে খুইয়ে বসে। সাম্রাজ্যবাদী লুঠেরাদের সর্দারের আসন নেয় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। মার্কিন উদ্যোগে বিশ্বসাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি পশ্চিম এশিয়ায় তাদের আধিপত্য বজায় রাখতে জবরদস্তি প্যালেস্টিনিয় আরবদের উচ্ছেদ করে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে সেখানে স্থায়ী অশান্তির বীজ বপন করে এবং ইসরায়েলের ইহুদিবাদী শাসকদের হাতে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র তুলে দেয়। পশ্চিম এশিয়ায় আরব জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে তারা ইসরায়েলকে কাজে লাগায়। এর দ্বারা সাম্রাজ্যবাদের কিছু স্বার্থ পূরণ হলেও, এর প্রতিক্রিয়ায় পশ্চিম এশিয়ার দেশে দেশে জনগণের মধ্যে প্রবল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। আরব জাতীয়তাবাদ তীব্র হয়। এই বিদ্বেষকে এখন পশ্চিমের বিরুদ্ধে ইসলামের ঘৃণা বলে চিহ্নিত করতে, সাম্রাজ্যবাদী ও মৌলবাদী উভয় শক্তিই চেষ্টা করছে যাতে জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মানসিকতাকে মৌলবাদের বন্ধ্যা ভাবধারায় আটকে ফেলা যায়। মৌলবাদী চিন্তা যে বন্ধ্যা, তা যে সমাজবিপ্লব ঘটাতে পারে না, ইরানের তথাকথিত 'ইসলামিক বিপ্লব'-এর পরিণতিই তার জ্বলন্ত নজির।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আরব জাতীয়তাবাদের জোয়ারে মিশর সরকার, লিজের নামে দখলদারির মেয়াদ শেষ হওয়ার ১২ বছর আগেই ১৯৫৬ সালে সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করতে গেলে পরোক্ষ মার্কিন মদতে ইঙ্গ-ফরাসি সাম্রাজ্যবাদ মিশর আক্রমণের হুমকি দেয়। স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েটে সংশোধনবাদী নেতৃত্ব ক্ষমতায় এলেও সোভিয়েট বৈদেশিক নীতিতে স্ট্যালিনের প্রভাব তখনও যথেষ্ট বিদ্যমান ছিল। ইঙ্গ-ফরাসি সাম্রাজ্যবাদ প্রথমে রাষ্ট্রসংঘের মাধ্যমে সুয়েজের ওপর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব আনে, কিন্তু সোভিয়েট ভেটোতে তা খারিজ হয়ে যায়। ব্যর্থ হয়ে ইঙ্গ-ফরাসি জোট '৫৬ সালের ৩০ অক্টোবর ইসরায়েলকে দিয়ে মিশর আক্রমণ করায় এবং পরদিনই নিজেরা যুদ্ধে যোগ দিয়ে কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া, পোর্ট সৈয়দ শহরে বিমানবহর নিয়ে বোমা ফেলে। ৫ নভেম্বর সোভিয়েট ইউনিয়ন স্পষ্ট ভাষায় বলে — "প্রাচ্যে শান্তি রক্ষা ও আগ্রাসীদের ধ্বংস করতে আমরা সামরিক শক্তি প্রয়োগ করব — এটাই আমাদের সিদ্ধান্ত।" কেবল কাগুজে প্রস্তাব নয়, একই সঙ্গে সোভিয়েট নেতৃত্ব যুদ্ধজাহাজ পাঠানোর নির্দেশ দিলে ইঙ্গ-ফরাসি সাম্রাজ্যবাদ এবং সেই সাথে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পিছু হটে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সর্বশেষ মোক্ষম আঘাত পায় ভিয়েতনামে। নাপাম বোমা ও রাসায়নিক অস্ত্রে সুসজ্জিত মার্কিন সেনাবাহিনী ভিয়েতনামের কমিউনিস্টদের হাতে চরম মার খাওয়ায় মার্কিন সামরিক দম্ভ ধূলায় লুটিয়ে পড়ে।

কিন্তু পরবর্তীকালে সংশোধনবাদী নেতৃত্বের দুর্বলতা ও আপসের সুযোগ নিয়ে ১৯৯১ সালে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং গরবাচেভ প্রতিবিপ্লবী চক্র সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপে

ছয়ের পাতায় দেখুন

অযোধ্যায় খননকার্য

উদ্দেশ্য ইতিহাস-অনুসন্ধান নয়

বিজেপি জোট সরকারের গত কয়েক বছরের শাসনে জনজীবনে নাভিঃশ্বাস উঠেছে। নেমে আসছে একের পর এক আক্রমণ। প্রতিদিনই কোনও না কোনভাবে একটা না একটা অজুহাত সৃষ্টি করে তারা সাধারণ মানুষের জীবনে আঘাত হানছে। সেই আঘাতের বিরুদ্ধে দেশের মধ্যে গণবিক্ষোভও ক্রমাগত তীব্র হচ্ছে। এই অবস্থায় মূল সমস্যা থেকে জনগণের দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে দিয়ে কয়েকটি রাজ্যের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে এবং আগামী লোকসভা নির্বাচনে ফয়দা তুলতে নানান কৌশলে উগ্র ধর্মান্ধতা ও তথাকথিত হিন্দুত্বের জিগির তোলার রাস্তা তারা গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে গুজরাটে সংখ্যালঘু জনসাধারণের মারণযজ্ঞ করে, তাদের রক্ত আর শবদেহের উপর হেঁটে বিজেপি নেতা নরেন্দ্র মোদী পুনর্বার গদি দখল করার পর বিজেপি আরও বেশি করে 'হিন্দুত্বের' জিগির তুলছে নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার জন্য। যদিও গুজরাট পরবর্তী হিমাচল প্রদেশের নির্বাচনে একই কৌশল প্রয়োগ করেও তারা বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি, তা সত্ত্বেও এ ভিন্ন বিজেপি'র সামনে নির্বাচনে ভোট পাওয়ার দ্বিতীয় কোন পুঁজি নেই।

এই প্রেক্ষাপটে গত ৫ মার্চ অযোধ্যা মামলায় একটি নাটকীয় নির্দেশ দিয়েছে এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চ। বিচারপতিরা নির্দেশ দিয়েছেন, বাবরি মসজিদ এলাকা খনন করে দেখতে হবে সেখানে মন্দির বা সেই ধরনের কোনও কাঠামো ছিল কিনা এবং তা ধ্বংস করে বিতর্কিত জমিতে মসজিদ নির্মিত হয়েছিল কিনা। দেশজুড়ে এই রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

একথা সকলেই স্মরণ করতে পারবেন যে, সুপ্রিম কোর্টের ফুল বেঞ্চ ১৯৯৪ সালের ২৪ অক্টোবর এই প্রশ্নে রাষ্ট্রপতির রেফারেন্স সত্ত্বেও তা ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছিল কোন উত্তর না দিয়েই। একথাও সকলেরই জানা যে, আদালত জমির স্বত্ব নির্ধারণ করতে পারে আইন মাফিক, কিন্তু জমির নীচে মন্দির, মসজিদ বা অন্য কোন কাঠামো আছে কী নেই, বা স্তরে স্তরে কোন্ অতীতে কি কাঠামো ছিল তার ভিত্তিতে জমির স্বত্ব নির্ধারণ করবার কোনও আইন বা রীতি নেই। একটিমাত্র ব্যতিক্রম আছে, তা হচ্ছে যদি কোন জমির নীচে খনন করে দেখা যায় যে, সেখানে সোনা, তেল বা খনিজ পদার্থের উৎস রয়েছে একমাত্র সেখানেই জমির মালিককে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে সরকার তা অধিগ্রহণ করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, এ প্রশ্নও উঠেছে যে, বাবরি মসজিদ ধ্বংস সংক্রান্ত মামলার সমস্ত শুনানি যখন প্রায় সমাপ্তির পথে এবং যখন রায় দানের মত অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে সেই সময়ে সেই বিশেষ স্থানে মন্দির বা মসজিদের কাঠামো ছিল কি ছিল না, তা জানার উদ্দেশ্যে খননের কথা হঠাৎ উঠল কেন? তাছাড়া এক মাসের মধ্যেই খননের কাজ শেষ করে, তার এক সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলার মধ্যে যে অস্বাভাবিক দ্রুততার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যাচ্ছে তারই বা উদ্দেশ্য কি? যদিও পরবর্তীকালে সময়টা কিছু বাড়ানো হয়েছে।

তৃতীয়ত, খননের সময় যাতে কোনওভাবেই, যে অস্থায়ী মঞ্চে রামলালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাতে আঁচড় না পড়ে এবং অস্থায়ী মঞ্চের দর্শনার্থীদের কোনওভাবে যাতে বিরক্ত না করা হয় তার নির্দেশটি নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে এইজন্যই যে, খনন যদি করতেই হয় তাহলে তার ঠিকঠিক জায়গাটি তো যেখানে রামলালা প্রতিষ্ঠিত সেইখানেই। কারণ রামভক্তদের বিশ্বাসই বলছে এই স্থানটিতেই রাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং এই স্থানেই ছিল মন্দির! বিশিষ্ট ঐতিহাসিকরা তাই দৃঢ়তার সঙ্গেই উল্লেখ করেছেন, পুরো জায়গা জুড়ে খনন না করলে সাজানো প্রত্নতত্ত্বের সম্ভাবনাই বেশি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্টের একজন প্রবীণ আইনজীবী ও দেশের তিনজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক এই প্রত্নতাত্ত্বিক খননের সমালোচনা করেছেন। ১৯৯৩ সালের ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের প্রস্তাবের উল্লেখ করে তাঁরা বলেছেন, ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর বাবরি-মসজিদ ধ্বংসের ঘটনাকে যুক্তিগ্রাহ্য করার এরকম পদক্ষেপ সমগ্র দেশের অসংখ্য ঐতিহাসিক পুরাকীর্তির ভবিষ্যৎকে বিপন্ন করে তুলবে। দশ বছর আগেকার যে দৃষ্টিভঙ্গিকে ঐতিহাসিকরা অসহনীয় বলে অভিহিত করেছিলেন বর্তমানে দুর্ভাগ্যজনক হলেও তা বিচারব্যবস্থার নীরব স্বীকৃতি এবং সমর্থন পেয়ে গেল।

একথা নিশ্চয়ই সকলে স্মরণ করতে পারবেন যে, ১৯৯১ সালে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নেতা অশোক সিংঘল এক সাংবাদিক সম্মেলনে যখন কিছু খোদাই পাথর ও হস্তনির্মিত শিল্পকর্ম দেখিয়ে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিলেন যে রামমন্দির ভেঙে বাবরি মসজিদ তৈরি হয়েছিল, তখন সংবাদমাধ্যমের উপস্থিত সকলের কাছেই তাঁকে হাস্যাস্পদ হতে হয়েছিল।

অধ্যাপক বি বি লাল ১৯৭৫-৭৬ সালে 'রামায়ণের পুরাতত্ত্ব' নামে একটি প্রকল্পে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেই রিপোর্টে দ্বাদশ শতকের একটি লিপির কথা বলা হয়েছে যাতে রামমন্দিরের অবস্থানের প্রমাণের কোন উল্লেখ ছিল না। এর মধ্যে অধ্যাপক বি বি লাল ডিগবাজী খেয়ে 'হিন্দুত্ব' প্রচারের মুখপাত্রে পরিণত হয়েছেন ১৯৯০ সাল থেকে। তাই ত্রিশ বছর আগে যা বলেন নি, বর্তমানে তাই বলছেন। ঐতিহাসিকরা, তাঁর এই প্রকল্পের কাজের প্রত্নতাত্ত্বিক নোটবই বারবার দেখতে চাইলেও তিনি তা দেখাননি। এমনকি ভারতের পুরাতত্ত্ব পর্ষদ বা এ এস আই-ও সেই নোটবই-এর সামান্য অংশমাত্র দেখিয়েছে। স্বভাবতই তাঁদের বক্তব্যের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রবল সন্দেহ বর্তমান। সর্বোপরি দশ বছর ধরে আদালত অধ্যাপক লালের খননের রিপোর্ট না পাওয়া সত্ত্বেও অস্বাভাবিক দ্রুততায় এক মাসের মধ্যেই খননের রিপোর্ট কিভাবে পেতে পারে তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যেই সংশয় দানা বেঁধেছে এবং তাঁরা এই নির্দেশে বিস্মিত ও হতবাক। তাঁরা মন্তব্য করেছেন, এহেন পরিস্থিতিতে খননের ফলে যা পাওয়া যেতে পারে তা একমাত্র 'করসেবকদের প্রত্নতত্ত্ব' ছাড়া আর কিছু নয়।

তাছাড়া ভারতের পুরাতত্ত্ব পরিষদকে (এ এস আই) যেভাবে খননের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং যে ব্যক্তিকে খননের জন্য কনট্রাক্ট দেওয়া হয়েছে — এ দুটোই বিতর্কের উর্ধ্বে তো নয়ই, বরং এ ব্যাপারে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ ওঠার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

প্রথমত, আদালতের পক্ষ থেকে খননের নির্দেশ দেওয়ার মাত্র দুদিন আগে অর্থাৎ ৩ মার্চ এ এস আই-এর ডিরেক্টর জেনারেল পরিবর্তন করে সেখানে আর একজনকে নতুন করে নিয়োগ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এ এস আই-এর পক্ষ থেকে যে ১৪ জনের টিমকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তার নেতৃত্বে রাখা হয়েছে ডঃ বি আর মনিকে যার প্রত্নতাত্ত্বিক খননের কোনওরকম পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। দ্বিতীয়ত, খননের কনট্রাক্ট দেওয়া হয়েছে কৃষ্ণ কুমার পাণ্ডে নামে এক ব্যক্তিকে — যিনি বিজেপি সদস্য এবং ফৈজাবাদে দলের যুব সংগঠনের সক্রিয় কর্মী। উত্তরপ্রদেশ বিজেপি'র সভাপতি, সাংসদ ও বজরং দলের প্রধান বিনয় কাটিয়ারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এই কৃষ্ণকুমার পাণ্ডে। তাঁর কাজে যে পক্ষপাতিত্ব থাকবেই তারও প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে ইতিমধ্যেই। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানিয়েছেন মোট ৮২ জন ঠিকা শ্রমিককে আইডেন্টিটি কার্ড দিয়ে নিয়োগ করা হবে। তাদের কাজেও নজরদারি থাকবে, তবে ঠিকা শ্রমিকদের মধ্যে কেউই মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত নয়। কারণ মুসলমান সম্প্রদায়ের কেউই নাকি এই কাজে আগ্রহী নন।

এই সমস্ত দেখে বিশিষ্ট ঐতিহাসিকরা বলেছেন যে, এই প্রত্নতাত্ত্বিক খনন বাস্তবিকপক্ষে উগ্র হিন্দুত্ববাদী চিন্তায় প্রভাবিত 'করসেবক প্রত্নতত্ত্বের' দিকেই জনমতকে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াসে পর্যবসিত হবে।

এই সংশয় ঘনীভূত হচ্ছে আরও এইজন্য যে, '৯০-এর দশকের সূচনায় বিশ্বহিন্দু পরিষদ নেতা অশোক সিংঘল, রামচন্দ্র দাস সহ তথাকথিত হিন্দুত্ববাদীরা কোনওরকম খননের প্রশ্নকেই উড়িয়ে দিয়েছিল। অথচ আজ তারাই হঠাৎ খুব বেশি করে এই খননের নির্দেশে পুলকিত। বিজেপি নেতা বিনয় কাটিয়ার এও বলেছেন যে, 'আমরা শুধু খননের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছি তাই নয়, আমরা একইভাবে আরও যে ধর্মস্থানগুলি ধ্বংস করা হয়েছে সেখানেও একইভাবে খনন করে তার পুনঃস্থাপনের দাবি জানাব।' তাদের এই তালিকায় রয়েছে কাশী, মথুরা, তাজমহল সহ আরও ৩০,০০০ স্থান।

গুজরাটের নির্বাচনে 'হিন্দুত্ব'র জিগির তুলে সংখ্যালঘু নিধন করে সরকারি গদি দখল করার পর আর এস এস আগামী নির্বাচনগুলিকে সামনে রেখে, আবার মন্দির ইস্যু'তে ফিরে আসার যে কথা ঘোষণা করেছে তার সঙ্গে বাবরি মসজিদ এলাকার বিতর্কিত স্থানে এই খননের যে যোগ রয়েছে তা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা উচিত বলে আমরা মনে করি। প্রশ্ন হল ভারতবর্ষের জনসাধারণের জীবনে এই বিষয়টাই কি আজ প্রধান সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে? জনজীবন যখন চূড়ান্ত অর্থনৈতিক সঙ্কটে বিপর্যস্ত, বাঁচার পথ যেখানে ক্রমশ রুদ্ধ হয়ে আসছে সেখানে এই সমস্যাটিকেই প্রধান করে তোলা হচ্ছে কেন? তাছাড়া যদি ধরেও নেওয়া যায় প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে মন্দিরের কোনও ধ্বংসাবশেষ সেখানে পাওয়া গেল — তাহলেই কি কোন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ, কোন ইতিহাসবিদ বাবরি মসজিদ ভাঙা যুক্তিসিদ্ধ বলে মেনে নেবেন, বা মেনে নিতে পারেন? অথবা সেই ধ্বংসস্তূপের উপর নতুন করে মন্দির নির্মাণ করার দাবি গ্রহণযোগ্য হতে পারে? একইভাবে যদি দেখা যায় আরও গভীরে খনন কার্য চালিয়ে সেখানে অন্য কোনও ধর্মস্থানের চিহ্ন পাওয়া যায় তাহলে ওই স্থানে কি আবার মন্দির ভেঙে সেই ধর্মস্থান নির্মিত করা যুক্তিগ্রাহ্য হবে? যেমন ইতিমধ্যেই জৈন সমতা বাহিনীর সচিব সোহন দাবি জানিয়েছেন, 'খনন কার্য থেকে রামমন্দির নয়, উদ্ধার হবে ষষ্ঠ শতকের এক প্রাচীন জৈন মন্দির। আমরা আশা করছি, সেই ক্ষেত্রে জায়গাটি শেষপর্যন্ত আমাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।' এইভাবে পরস্পর দাবি পাল্টা দাবি, খননের পর খননের শেষ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?

আমরা ইতিহাস থেকে একথা সকলেই জানি, মধ্যযুগীয় শাসনে নানান ক্ষেত্রে নানান সময়ে রাজায় রাজায় বহু যুদ্ধ, লুঠতরাজ, ধনসম্পদ হরণের ঘটনা ঘটেছে। সেই সমস্ত যুদ্ধ, ধর্মকে হাতিয়ার করা সহ মন্দির মসজিদ মঠ ধ্বংসের অসংখ্য ঘটনায় পরিপূর্ণ। খোদ অযোধ্যাতেই অতীতে একসময় একশত বৌদ্ধমঠ এবং মাত্র দশটি হিন্দু মন্দির ছিল। আজ সেখানে বৌদ্ধমঠের কোন অস্তিত্বই নেই, সবই হিন্দু মন্দির দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিহার রাজ্যের নামকরণের পেছনেই ছিল প্রচুর সংখ্যায় বৌদ্ধবিহারের উপস্থিতি। সেগুলিও ধ্বংস করে সেইসব স্থানে মন্দির নির্মিত হয়েছে। হিন্দুধর্মের প্রবক্তা বিবেকানন্দ নিজেই পুরীর জগন্নাথ মন্দির যে আগে একটি বৌদ্ধমঠ ছিল তা স্বীকার করেছেন। বর্তমান সময়ে কেউ যদি এগুলি সব ভেঙে সেইসব স্থানে পুনরায় মঠ তৈরির দাবি জানায় তা কি আধুনিক সভ্য জীবনে গ্রহণযোগ্য হতে পারে?

তাছাড়া ইতিহাসে এও দেখা গিয়েছে যে, শুধু অযোধ্যাতে কেন, গোটা উত্তরপ্রদেশেই ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত কোন রামমন্দিরের অবস্থান ছিল না। রামায়ণ বা নানান হিন্দুধর্মগ্রন্থেও ঐ সময়ে সেখানে রামমন্দিরের অবস্থানের কোন উল্লেখ নেই। এমনকি যীশুখৃষ্টের জন্মের ৪০০ বছর পরে রচিত বিষ্ণুস্মৃতির ৮৫নং অধ্যায়ে উল্লিখিত ৫২টি তীর্থের তালিকাতেও নেই রামমন্দিরের নাম বা অযোধ্যার উল্লেখ। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দের আগে রামমন্দিরের অস্তিত্ব থাকলে 'রামচরিতমানসেও' অন্তত তার উল্লেখ থাকত। তাও নেই। বিজেপি বা সংঘপরিবারের সঙ্গে বর্তমানে যুক্ত অধ্যাপক বি বি লালের রিপোর্টের কথা আগেই বলা হয়েছে। বরং এই রিপোর্টে প্রমাণিত হয়েছিল যে, খৃষ্টপূর্ব ৭০০ অব্দের পূর্বে অযোধ্যায় কোন জনবসতিই ছিল না। এই অবস্থায় সাড়ে চার হাজার বছর আগে রামের জন্মানোও একটা অসম্ভব ব্যাপার।

তাছাড়া পুরাকীর্তির নামে অসাধু ব্যবসার দুনিয়া জুড়ে কারবারের কথা ভুক্তভোগীমাত্রই জানেন। আরও একটা কথা এখানে বলা দরকার। যে দেশের পুলিশ-প্রশাসনের একটা উল্লেখযোগ্য অংশের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মানসিকতা বর্তমান যা বিভিন্ন সময়ে রায়টে খুব খোলাখুলি দেখা যায় এবং যে দেশে প্রশাসনের উচ্চপদাধিকারী ব্যক্তির সহায়তায় রাতের অন্ধকারে চুপিচুপি রামলালার মূর্তি পর্যন্ত বসানো চলে, সেখানে একটি ঘোর সাম্প্রদায়িক দলের তদারকিতে খননকার্যের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

তাহলে দেখা যাচ্ছে এ সবের আসল উদ্দেশ্য ইতিহাস অনুসন্ধান নয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষের মধ্যে যে ধর্মীয় আবেগ রয়েছে তাকেই কাজে লাগিয়ে বিজেপি বা সংঘপরিবারের

সাতের পাতায় দেখুন

বাজার অর্থনীতি ও পার্লামেন্টারি ডেমোক্র্যাসি আজ কাঠগড়ায়

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কনভেনশনে কমরেড প্রভাস ঘোষ

(৮ এপ্রিল ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরামের কনভেনশনে এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের বক্তব্য।)

আজ ইরাকে যে ভয়ঙ্কর ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা চলছে, সমগ্র বিশ্বের জনগণ তাতে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত, তারা সর্বত্র বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে। আমাদের এখানেও আজ এই সম্মেলন আহবান করা হয়েছে এখানকার প্রতিবাদকে ধ্বনিত করার জন্য, কিছু কার্যকরী কর্মপন্থা নির্ধারণ করার জন্য।

আপাতদৃষ্টিতে আমেরিকা ইরাক আক্রমণ করেছে ২০ মার্চ, কিন্তু বাস্তবে ইরাকে আক্রমণ চলছে গত ১২ বছর ধরে। অর্থনৈতিক অবরোধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, খাদ্য সরবরাহ বন্ধ, ওষুধও পাচ্ছেনা ইরাকের জনগণ। ২ কোটি ৩৬ লক্ষ মানুষের দেশ, এ পর্যন্ত প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষ মারা গেছে, যার মধ্যে প্রায় ৮ লক্ষই হচ্ছে শিশু। এ সবটাই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ করছে গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতা রক্ষার নামে। এবারেও সর্বাধুনিক মারণাস্ত্র নিয়ে আকাশপথে, নৌপথে, স্থলপথে যে আক্রমণ তারা চালাচ্ছে তাতে আরও কত মানুষ মারা যাচ্ছে, কে জানে।

এই আক্রমণের পিছনে মূল কারণরূপে কাজ করছে মার্কিন-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিজস্ব সংকট। বাজার অর্থনীতি তীব্র বাজার সংকটের সামনে পড়েছে, এই সংকটের হাত থেকে বাঁচবার জন্যই তারা এই দানবীয় আক্রমণ চালাচ্ছে। ফলে, কেবল বুশ-ব্লেয়ারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করালেই হবে না। এই অন্যায় যুদ্ধের জন্য বিশ্ব মানবতার আদালতে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে পুঁজিবাদ বা বাজার অর্থনীতি এবং বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি ডেমোক্র্যাসি। পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখার জন্য যে বাজার চাই, সেই বাজার আজ আর দেশের ভিতরে বাইরে নেই, প্রবল মন্দা চলছে। মার্কিন দেশে গত ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে ৪ লক্ষ ৬৭ হাজার শ্রমিক ছাঁটাই হয়ে গেছে। প্রায় প্রতি মাসেই ছাঁটাই চলছে, কলকারখানা বন্ধ হচ্ছে। যে আমেরিকা অন্য দেশকে ঋণ দেওয়ার কথা বলে, সে নিজেই আজ বিশ্বে সর্বাপেক্ষা ঋণগ্রস্ত। তার বাণিজ্যে ঘাটতিও সবচেয়ে বেশি। ওরাই ওদের অর্থনীতিকে বলে 'বাবল্ ইকনমি'। গোটা বিশ্বের পুঁজিবাদী অর্থনীতিই আজ বুদ্বুদের মত, কখনও ফুলে ফেঁপে উঠছে তারপরই ফেটে যাচ্ছে। এই অবস্থায় তার বাজার চাই, বাজারের জন্যই যুদ্ধ। বহুদিন আগে মহান লেনিন বলেছিলেন, সাম্রাজ্যবাদ মানেই যুদ্ধ, পররাজ্য আক্রমণ, পরদেশ লুণ্ঠন। এ ঘটনা আমরা প্রথম মহাযুদ্ধে দেখেছি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও দেখেছি, পরেও নানা ক্ষেত্রে বারবার দেখেছি, আজ ইরাকেও আমরা সেটাই দেখেছি। মহান স্ট্যালিন বলেছিলেন, এই সঙ্কটের সময়ে ওরা তাদের অর্থনীতিকে বাঁচাবার জন্য যুদ্ধশিল্পের উপর জোর দেয়। অর্থাৎ যুদ্ধ বাধিয়ে মজুত অস্ত্রের ভান্ডার খালাস করে। নতুন অস্ত্র নির্মাণের অর্ডার আসে, যুদ্ধশিল্প চাঙ্গা হয়। আমেরিকার আজ এটা প্রয়োজন। ফলে, শুধু তেলের জন্যই আক্রমণ করছে, তা নয়। আবার তেলও তার প্রয়োজন। তেলের বাজারে তার কর্তৃত্ব চাই। যার মধ্য দিয়ে তেলের উপর নির্ভরশীল অন্যান্য দেশের অর্থনীতির উপর সে কর্তৃত্ব স্থাপন করতে চায়। এছাড়াও আর একটা স্বার্থে ধ্বংস ওদের চাই। ওরা নিজেরাই বলছে, ধ্বংসপ্রাপ্ত ইরাকের পুনর্গঠন ওরা করবে। এখন ইরাকের স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল-বাড়ি, ব্রিজ, কল-কারখানা যা কিছু আছে ধ্বংস করছে, এরপর হবে পুনর্গঠন। আমেরিকার কোম্পানিগুলি অর্ডার পাবে। টাকা দেবে কে? ইরাকের তেলখনি টাকা দেবে। ঐ তেলের টাকায় ইরাকে পুনর্নির্মাণ হবে, চাঙ্গা হবে আমেরিকার অর্থনীতি। তাই পুনর্গঠনের অর্ডার কে নেবে, এজন্য যেমন মার্কিন দেশের কোম্পানিগুলির মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে গেছে, তেমনি এ নিয়ে মার্কিন দেশের সাথে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে ব্রিটেনের এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলোর।

আমরা লক্ষ্য করছি, যেকথা স্ট্যালিন বলেছিলেন, ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদীরাও বেশিদিন আমেরিকার আধিপত্য মানবে না। ইতিমধ্যেই মার্কিন-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ফরাসী-জার্মান সাম্রাজ্যবাদ পাল্টা একটা শক্তি হিসাবে মাথা তুলছে। ইরাক যুদ্ধ নিয়ে তাদের যে দ্বন্দ্ব, তার মধ্যেও আছে বাজার নিয়ে লড়াই। এছাড়া আর একটা জিনিসও লক্ষ্য করার মতো। আমাদের দেশের ও বিদেশের বুর্জোয়া প্রচারমাধ্যমে বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের মহিমা কীর্তন করা হয় এবং তার পীঠস্থান বলা হয় আমেরিকা ও ব্রিটেনকে! আমেরিকার পার্লামেন্ট-কংগ্রেস-সেনেট, ব্রিটেনের হাউস অফ কমনস্ — এরা যুদ্ধের পক্ষে মত প্রকাশ করেছে। আমেরিকা ও ব্রিটেনের এই পার্লামেন্ট কার প্রতিনিধি? আমেরিকা ও ব্রিটেনের জনগণের? না, কারণ, জনগণ যুদ্ধ চাইছে না। আসলে এই পার্লামেন্ট হচ্ছে আমেরিকা ও ব্রিটেনের যুদ্ধ ব্যবসায়ীদের, একচেটে পুঁজিপতিদের, সাম্রাজ্যবাদীদেরই প্রতিনিধি, জনগণের নয়। বিশ্বের কোথাও আজ পার্লামেন্টারি ডেমোক্র্যাসি জনগণের স্বার্থকে বহন করে না। পার্লামেন্টারি ডেমোক্র্যাসি একসময় যে স্লোগান তুলেছিল — ফর দি পিপল্, অফ দি পিপল্, বাই দি পিপল্; স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী — সেই স্লোগান ও ঝাণ্ডা আজ সে ছুঁড়ে ফেলেছে, তাকে পদদলিত করছে। আমেরিকার কাছে রাষ্ট্রসংঘ হচ্ছে পায়ের জুতোর মতো — প্রয়োজনে সে পায়ে পরে, আবার প্রয়োজনে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, যেমন এবার সে করেছে। ওদের ডলার সাম্রাজ্যের কাছে কোনও আইন কানুন সংবিধান সনদ কোনও কিছুরই কোনও মূল্য নেই। এটাই আজ ঘটছে। কিন্তু এটা করার ঔদ্ধত্য সে দেখাতে পারছে কি করে?

আজ আমরা বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদ দেখছি। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় মানুষের যুদ্ধবিরোধী মত এমন ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ করেনি, আজকের প্রতিবাদের চেহারা যথার্থই ঐতিহাসিক। কিন্তু এই প্রতিবাদ আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্ত, বিচ্ছিন্ন, অসংগঠিত। প্রয়োজন ছিল একটি শক্তিশালী বিপ্লবী নেতৃত্বের যে এই প্রতিবাদকে সঠিক পথে সংগঠিত ও পরিচালিত করতে পারে। সেটা ঘটলে আজকের এই প্রতিবাদ কার্যকরী প্রতিরোধ আন্দোলনের চেহারা নিত।

৮ এপ্রিল মার্কিন-ব্রিটিশ পণ্য বয়কট আন্দোলনের সমর্থনে নাগরিক কনভেনশনের মঞ্চে উপবিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

অন্যদিকে আজ যদি সোভিয়েট ইউনিয়ন থাকত এবং সে যদি মহান লেনিন-স্ট্যালিনের বৈপ্লবিক লাইন নিয়ে চলত, তাহলে কি আমেরিকা-ব্রিটেন এভাবে ইরাকে আক্রমণ চালাতে পারত? ১৯৫৬ সালে যখন স্ট্যালিন প্রয়াত কিন্তু শোধনবাদী ক্রুশ্চেভ নেতৃত্ব স্ট্যালিনের নেতৃত্বের বৈপ্লবিক ঐতিহ্যকে তখনও পুরোপুরি লুপ্ত করতে পারেনি, সেইসময় মিশর সুয়েজ ক্যানাল জাতীয়করণ করেছিল। ইঙ্গ-ফরাসী যে কোম্পানির হাতে সুয়েজ ক্যানালের মালিকানা ছিল, তাদের স্বার্থে ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা মিশর আক্রমণ করেছিল, পিছনে মদত ছিল আমেরিকার। আজকের ইরাকের মতই ধ্বংস হতে যাচ্ছিল মিশর। সেই সময় আক্রান্ত মিশরের জনগণের পক্ষে, বিশ্বের জনগণের পক্ষে সোভিয়েট ইউনিয়ন আবেদন জানিয়েছিল ব্রিটেন ও ফ্রান্সের জনগণকে এই আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য। পাশাপাশি ঐ দুই দেশের শাসকদের বারো ঘণ্টা সময়সীমা দিয়ে হুমকি দিয়েছিল যে, অবিলম্বে মিশরে আক্রমণ বন্ধ না করলে লণ্ডন ও প্যারিসে পাল্টা বোমাবর্ষণ করতে সোভিয়েট ইউনিয়ন বাধ্য হবে। ১২ ঘণ্টা লাগেনি, ৬ ঘণ্টার মধ্যেই ব্রিটিশ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা পিছু হটেছিল।

আজ যদি মহান মাও সে-তুঙের বৈপ্লবিক লাইনে চীন পরিচালিত হত, চীনকে যদি সংশোধনবাদ গ্রাস না করত — চীন আজ বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারত।

আমাদের দেশে ও বিদেশে বুদ্ধিজীবী বলে পরিচিত একদল মানুষ, যারা সোভিয়েট ইউনিয়নে ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ে উল্লসিত হয়েছিলেন এবং যারা আমেরিকাকে 'গণতন্ত্রের রক্ষক', 'মুক্ত দুনিয়ার ত্রাতা' বলে অভিহিত করে থাকেন, আজ তারা চোখের সামনে দেখছেন সেই আমেরিকা কীভাবে একটা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে ধ্বংস করছে। অথচ রবীন্দ্রনাথ কমিউনিস্ট ছিলেন না, তবুও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যখন ফ্যাসিস্ট জার্মানির আক্রমণে ইউরোপ বিপন্ন, রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুশয্যায় শায়িত, সেসময় প্রশান্ত মহলানবিশ লিখছেন, রবীন্দ্রনাথ তখনও জানতে চেয়েছেন ঐ যুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়ন কী ভূমিকা নিচ্ছে। বারবার বলেছিলেন, সোভিয়েট ইউনিয়নই একমাত্র ফ্যাসিস্ট জার্মানীকে রুখতে পারবে। একইভাবে সোভিয়েট ইউনিয়নের দিকে তাকিয়ে ছিলেন রমা রল্যাঁ, বার্ণার্ড শ, আইনস্টাইন। আমাদের দেশে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, বিশ্বের ভরসা স্ট্যালিন — তিনি এখনও বেঁচে আছেন।

সেই পরিস্থিতি আজ পাল্টে গেছে, যার সুযোগ নিয়েই আমেরিকা ও ব্রিটেন, বিশ্বজনমতের প্রবল বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও, এভাবে ইরাকে হামলা চালাতে পারল।

আমাদের দেশের শাসকগোষ্ঠীর ভূমিকাও আমরা দেখছি। এদেশের শাসকগোষ্ঠীও একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থে আমেরিকার ইরাক আক্রমণের বিরুদ্ধে কোনও বলিষ্ঠ ভূমিকা নিচ্ছে না। একদিকে ভারতের জনগণকে সন্তুষ্ট করার জন্য তারা ভাব দেখাচ্ছে যেন এই যুদ্ধ তারা পছন্দ করছে না, অন্যদিকে পার্লামেন্টে সরকার ও বিরোধী পক্ষ বারবার ডিকশনারী নিয়ে বসে দেখছে কোন্ ভাষায় বললে আমেরিকাও অসন্তুষ্ট হবে না, আবার জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনকেও খানিকটা সন্তুষ্ট করা যাবে। অথচ, বামপন্থী দল হিসাবে সি পি এম-এর পার্লামেন্টে দাবি তোলা উচিত ছিল, যে আমেরিকা ও ব্রিটেন ইরাকে এমন হামলা চালাচ্ছে, তাদের সাথে

আটের পাতায় দেখুন

যুদ্ধের পরও মার্কিন অর্থনীতির মন্দা কাটার লক্ষণ নেই

তিনের পাতার পর

সমাজতন্ত্রের পতন ঘটানোর পর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। হাজার দুর্বলতা ও সংশোধনবাদী বিকৃতি সত্ত্বেও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অস্তিত্ব বিশ্বশক্তির ভারসাম্য রক্ষা ও যুদ্ধকে ঠেকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে যতটুকু ভূমিকা পালন করছিল, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিপর্যয়ে সেই বাধা পুরোপুরি সরে যাওয়ায় তীব্র অর্থনৈতিক সংকট থেকে বাঁচতে মার্কিন সরকার পুনরায় যুদ্ধ বাধাতে মরিয়া হয়ে ওঠে। যেসব শিল্পে আজও আমেরিকার বিশ্বজোড়া প্রাধান্য আছে তার মধ্যে দুটি হল অস্ত্র ও তেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর দুনিয়ায় শক্তির প্রধানতম উৎস হল তেল। মার্কিন এক্সনমবিল, শেভ্রান টেকসাকে এবং ব্রিটেনের শেল, ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি কোম্পানি দুনিয়ার তেলের বাজারের বৃহৎ অংশ নিয়ন্ত্রণ করে।

তেলের দামের ওঠানামা ঘটিয়ে দুনিয়ার অর্থনীতিকে যে বহুলপরিমাণে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় তা ফরাসি ও জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা জানে। ফ্রান্স এবং জার্মানির নিজস্ব তৈল ভাণ্ডার নেই। ইরানের মার্কিন বিরোধিতার সুযোগ নিয়ে সেখানকার তৈলসম্পদের ওপর ফ্রান্স প্রভাব বিস্তার করেছে। তাছাড়া ইরান সরকারের সঙ্গে চুক্তির ভিত্তিতে ফ্রান্স ইরানে তেল অনুসন্ধানের কাজেও বহু টাকা ঢেলেছে। জার্মানিও ইরাক সহ পশ্চিম এশিয়ায় তেলের ব্যবসায় বড় লগ্নি করেছে। অন্যদিকে রাশিয়ার শিল্প উৎপাদন এখনো বিপর্যয় কাটাতে পারেনি, রুশ সরকারের আয়ের প্রধান উৎস তেল বিক্রি। এই অবস্থায় বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তেলের ভাণ্ডার ইরাকের দখল পুরোপুরি নিজের হাতে নিয়ে বিশ্বব্যাপী তেলের বাজারে আমেরিকা যদি নিজের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে পারে তাহলে নিজের সুবিধা অনুযায়ী তেলের উৎপাদন বাড়ানো-কমানো বা দামের ওঠা-নামা ঘটানোর ক্ষমতা তার হাতে চলে যাবে এবং সেক্ষেত্রে ফ্রান্স, রাশিয়া ও জার্মানির বিরাট ক্ষতি।

তেলের ব্যবসায় ক্ষতির আশঙ্কা ফ্রান্স, জার্মানি এবং রাশিয়াকে 'যুদ্ধবিরোধী' অবস্থানে ঠেলে দিয়েছে। ৯১ সালে ইরাক আক্রমণে ফ্রান্স, জার্মানি সরাসরি মার্কিন যুদ্ধসঙ্গী ছিল। রাশিয়াও রাষ্ট্রসংঘে নীরব থেকেছে। তেল দখলের জন্য মার্কিন যুদ্ধ পরিকল্পনা দীর্ঘদিনের। ১৯৮৯ সালের ২ অক্টোবর মার্কিন সরকারের ন্যাশনাল সিকিউরিটি ডায়রেকটিভ ২৬-এ বলা হয়েছে ''Access to Parsian Gulf oil and the security of key friendly states in the area are vital to US national security. The United States is committed to defend its vital interests in the region, if necessary and appropriate through the use of U.S. military force.''

অর্থাৎ, পারস্য উপসাগরীয় তেল ও ওই অঞ্চলে মিত্র দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে প্রয়োজনে মার্কিন সরকার সামরিক শক্তি প্রয়োগ করবে। এর দুবছর পরই কুয়েতের নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলে মার্কিন সরকার প্রথম ইরাক আক্রমণ করে। যুদ্ধশেষে ইরাকের ওপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা চাপায় এবং 'নিরাপত্তা রক্ষার' জন্য কুয়েতে ঘাঁটি গেড়ে বসে। দশ বছরের মধ্যে ইরাকি শাসকদের এক পদক্ষেপে মার্কিন সরকার প্রমাদ গোনে। তেলের ব্যবসায় জার্মানির সেই সম্পর্কের সূত্র ধরে ইরাক আন্তর্জাতিক বাজারে ইরাকি তেল কেনাবেচায় ডলারের বদলে জার্মান মুদ্রা ডয়েস মার্ক চালু করে। ২০০ সালে চালু করে ইউরো।

বিশ্ববাণিজ্যে মূলত ডলারই কেনাবেচার প্রায় একমাত্র মাধ্যম হওয়ায় মার্কিন সরকার দেশীয় অর্থনীতি ও বৈদেশিক বাণিজ্যে বহু গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা পেয়ে থাকে। ডলার বিশ্ববাণিজ্যে বেচাকেনার প্রধান মাধ্যম না থাকলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিপদে পড়ে যাবে। ইতিমধ্যেই ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশ জার্মানি ফ্রান্স সকলে নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যে ডলারের বদলে ইউরো চালু করেছে, যা আমেরিকার পক্ষে চ্যালেঞ্জ। এখানে মুখ্য ভূমিকা জার্মানির। ১৯৯৫ সালে ইরাক কর্তৃক ডলারের পরিবর্তে তেলের ব্যবসায় মার্ক ও পরে ইউরো চালু করা মার্কিন সরকারের পক্ষে অশনি সঙ্কেত। সেই সঙ্গে মার্কিন অর্থনীতির সঙ্কট ও বেকারি দারুণভাবে বেড়ে যাওয়ায় মার্কিন দেশে বিশ্বায়নবিরোধী, বেকার সমস্যা বিরোধী আন্দোলন ধীরে ধীরে তীব্র রূপ নিচ্ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন সরকার এক ঘরে হওয়ার ঝুঁকি নিয়েও যুদ্ধে নেমে যায়।

যুদ্ধের পর এখন যেভাবে ফ্রান্স-জার্মানি ও রাশিয়া লুঠের বখরা যতদূর সম্ভব বেশি নেওয়ার জন্য আপস করছে তা আমেরিকার সঙ্গে এদের দ্বন্দ্বকে আপাতত লঘু করছে মনে হলেও, বাস্তবে তা নয়। বিশ্ববাজার দখল নিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘটার পর পরাজিত দেশগুলি অসম্মানজনক আপসে বাধ্য হলেও তা তারা দীর্ঘদিন মানেনি। শক্তি সঞ্চয় করে তারা আবার যুদ্ধে নামে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠা, ব্রিটিশ পাউণ্ডের বদলে বিশ্ববাণিজ্যে ডলার সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, জার্মানি ও জাপানকে আর্থিক ও সামরিক শর্তে বেঁধে ফেলার পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে। বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরেই স্ট্যালিন বলেছিলেন, জার্মান-জাপান দীর্ঘদিন মার্কিন বুটের তলায় থাকবে না। মার্কসবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্বের গভীর উপলব্ধি থেকে বলা তাঁর এই কথা আজ সত্য বলে প্রমাণিত। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ও জার্মান নেতৃত্বে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্ব আজ তীব্র আকার ধারণ করেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে আবার কার আধিপত্য থাকবে তা নিয়ে জার্মানি ও ফ্রান্সের সঙ্গে ব্রিটেনের দ্বন্দ্ব রয়েছে। আবার জার্মানী ও ফ্রান্সের মধ্যেও দ্বন্দ্ব আছে। ইরাক যুদ্ধে ব্রিটেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দোসর হলেও যুদ্ধের পরই ব্রিটেন ও জার্মানির বিদেশ মন্ত্রীদের মধ্যে বৈঠক থেকে সামরিক সমঝোতার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, ইরাক যুদ্ধের পর লুঠের ভাগ নিয়ে বা পারস্পরিক চাপ সৃষ্টির এসব বৈঠকে প্রত্যেকেই আস্তিনে ছুরি নিয়ে হাত মেলায়। সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে সংঘাত ও আপস এই দুই প্রক্রিয়াই চলতে চলতে আপসের সুযোগ শেষ হয়, শুরু হয় যুদ্ধ। কাজেই সাদ্দাম হোসেনের সরকারের পতনের মধ্য দিয়েই যুদ্ধ শেষ হবে না। মার্কিন শাসকরা ইতিমধ্যেই ৫০টি দেশের নাম করে রেখেছে যারা মার্কিন স্বার্থবিরোধী। আমেরিকা হুমকি দিচ্ছে ইরাকের ঘটনা থেকে অন্যেরা শিক্ষা নিক। যুদ্ধের পরেও মার্কিন অর্থনীতির মন্দা কাটার কোন লক্ষণ নেই; শেয়ারসূচক নেমে যাচ্ছে, বিশাল বাজেট ঘাটতি। কাজেই অর্থনৈতিক সংকট থেকে বাঁচতে মার্কিন যুদ্ধপ্রস্তুতি চলবে।

বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে যুদ্ধের বিরুদ্ধে দেশে দেশে জনগণকেই অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে এবং নিজ নিজ দেশের সরকারকে বলিষ্ঠ যুদ্ধবিরোধী ভূমিকা নিতে বাধ্য করতে হবে। ভারতের জনগণকেও আন্দোলনের চাপে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামরিক সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে ভারত সরকারকে বাধ্য করতে হবে। এটাও অত্যন্ত দুঃখজনক যে বৃহৎ বামপন্থী দলগুলি ভোটসর্বস্ব ও মালিকঘেঁষা নীতি নিয়ে চলায় গোটা দেশজুড়ে, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে যে ঐক্যবদ্ধ যুদ্ধবিরোধী তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার সম্ভাবনা ছিল তা কিছু মিটিং মিছিলের বাইরে যেতে পারেনি। আমাদের দলের পক্ষ থেকে দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সমস্ত বামপন্থী গণতান্ত্রিক দলের কাছে ইরাকে বর্বর মার্কিন-ইঙ্গ হামলার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বান জানিয়ে যে চিঠি দিয়েছিলেন তাতেও বিশেষত সি পি এম, সি পি আই সহ বড় দলগুলি সাড়া দেয়নি। আমরা আবারও বলতে চাই, সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির সঙ্গে আপস করে যুদ্ধকে ঠেকানো যায় না, জনতাকে সামরিক ঠকানো যেতে পারে। বিশ্বের দেশে দেশে এমনকি খোদ আমেরিকায় যুদ্ধের বিরুদ্ধে যে বিশাল সংখ্যক মানুষ পথে নেমেছেন, পুলিশি নিপীড়ণ সহ্য করেছেন, সাম্প্রতিক ইতিহাসে তা নজিরবিহীন। আরব দেশগুলিতে জনগণ মার্কিন বিরোধী বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে। যেসব আরব দেশ '৯১-এর যুদ্ধে আমেরিকার পাশে ছিল, এবার সেসব দেশের সরকারও যে যুদ্ধের বিরোধিতা করেছে তার একটা বড় কারণ তাদের তেলের স্বার্থ। তাদের নিজেদের স্বার্থেই তেলের

আটের পাতায় দেখুন

এই মুক্তি চাই না। ইরাকি তরুণীর উদ্যত তর্জনীর সামনে নিরুত্তর মার্কিন ট্যাঙ্ক কমান্ডার। ১২ এপ্রিল, ২০০৩ আনন্দবাজারে প্রকাশিত পি টি আই-এর ছবি

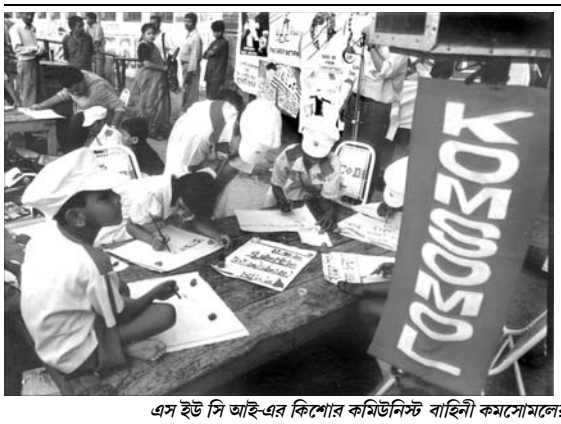

এস ইউ সি আই-এর কিশোর কমিউনিস্ট বাহিনী কমসোমলের সদস্যরা ১২ এপ্রিল কলকাতার ঢাকুরিয়া বাসস্ট্যান্ডে ছবি এঁকে যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। (ডাইনে) মার্কিন-ব্রিটিশ পণ্য বয়কট করার আবেদনে স্বাক্ষর দিচ্ছেন লেখিকা নবনীতা দেবসেন ও স্বাধীনতা সংগ্রামী বিভাস রায়।

বামফ্রন্টের নয়া কৃষিনীতি

চাষিকে বহুজাতিক সংস্থার ফাঁসকলেই ফেলবে

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ৬ মার্চ তাঁর মন্ত্রীসভায় খসড়া কৃষিনীতি পেশ করেন এবং তা নীতিগতভাবে গৃহীত হয়। মুখ্যমন্ত্রী এই খসড়া কৃষিনীতিকে 'বিকল্প কৃষিনীতি' বলে উল্লেখ করেন। প্রশ্ন হল এই 'বিকল্প কৃষিনীতি' কার বিকল্প? এর আগে শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন ম্যাকিনসের পরামর্শ অনুযায়ী একটি খসড়া কৃষিনীতি পেশ করায় তা নিয়ে প্রবল বিতর্ক হয়। বিরোধী দলগুলি সহ ফ্রন্টের অন্যান্য শরিকদল, এমনকি সি পি এম-এর কৃষক সংগঠনের নেতারা প্রবল আপত্তি করায় তা গ্রহণ করতে পারেনি রাজ্য সরকার। পরে কৃষিমন্ত্রী কমল গুহ একটি খসড়া কৃষিনীতি তৈরি করেন কিন্তু তাও গৃহীত হয়নি। অবশেষে অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত যে খসড়া কৃষিনীতিটি তৈরি করেন তা মন্ত্রীসভায় নীতিগতভাবে গৃহীত হয়। এই খসড়া কৃষিনীতি পেশ করে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেন, এই কৃষিনীতিতে 'উৎপাদনবৃদ্ধি, গবেষণা, কর্মসংস্থান এবং কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রসারে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ...আমাদের শক্তি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি দিয়েই এ কাজ করতে চাই। বহুজাতিক সংস্থার ফাঁসকলে পড়তে আমরা রাজি নই'। (গণশক্তি ৭.৩.০৩)

কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর এই বিকল্প কৃষিনীতি সত্যিই কি বহুজাতিক সংস্থার 'ফাঁসকল' থেকে কৃষকদের বিশেষ করে মধ্য ও গরিব চাষিদের রক্ষা করতে পারবে? সত্যিই কি গরিব ও মাঝারি চাষিদের জন্য রাজ্য সরকারের প্রাণ কাঁদছে? তা যদি হতো তাহলে ঋণভার-জর্জর অসহায় গরিব চাষি যখন ধানের দাম না পেয়ে জলের দামে ফড়েদের, ব্যবসায়ীদের কাছে অভাবি বিক্রি করে হতাশায় ভেঙে পড়েছে, আত্মহত্যা করে দেনার দায় থেকে মুক্তির পথ খুঁজছে, যখন তার ঘরে আর বিক্রির ধান নেই, তখন রাজ্য সরকার কুইন্টাল প্রতি ধানের দাম ৫৩০ টাকা বেঁধে দিয়ে সরকারিভাবে ধান কেনার এই প্রহসন করল কেন? যখন চাষিদের ঘরে ধান নেই তখন সরকারি দরে ধান কেনার নামে আসলে সরকার কিছু অসাধু মিলমালিক, ব্যবসায়ী ও পঞ্চায়েত প্রধানদের কোটি কোটি টাকা মুনাফা পাইয়ে দিল। আলু চাষিদের অবস্থাও তথৈবচ। ৮০ টাকা থেকে ১০০ টাকা কুইন্টাল দরে ব্যবসায়ী ও দালালদের কাছে আলু বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে আলুচাষিরা। সরকার কিছু সহানুভূতির কথা ও রঙিন প্রতিশ্রুতি ছাড়া আলুচাষিদের আর কিছু দেয়নি।

সার, বীজ, কীটনাশক, বিদ্যুৎ, ডিজেল, কেরোসিনের দাম ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। চাষিদের উৎপাদন খরচ যা, ফসল বিক্রি করে তার অর্ধেক দাম চাষিরা পাচ্ছে না। সরকার চাষিদের বলছে, প্রথাগত চাষ করলে এবং প্রয়োজনের তুলনায় বেশি উৎপাদন করলে, ফসলের দাম তো কমবেই। ফলে সরকার উপদেশ দিচ্ছে, এই ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে হলে কৃষকদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী অর্থকরী বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদন করতে হবে। যেন এটা করলেই চাষির ফসলের ন্যায্য দাম পাওয়ার আর কোন সমস্যা থাকবে না। অথচ, কে না জানে, যে কোন কৃষিপণ্য হোক, তার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার নিয়ন্ত্রণ করে বড় বড় ব্যবসায়ীরা তথা বর্তমান একচেটিয়া পুঁজিপতিরা। সাধারণ চাষিদের কোন ক্ষমতা নেই তা নিয়ন্ত্রণের। বর্তমানে কৃষিপণ্যের ব্যবসায়ে একচেটিয়া পুঁজিপতিরা ধীরে ধীরে প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকায় এবং নিয়ন্ত্রণের ভূমিকায় আসায় ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতাও লুপ্ত প্রায়। ফলে অর্থকরী বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদন করলেই চাষিরা ফসলের দাম পাবে একথা যারা বলে হয় তারা মূর্খ, না হয় জেনে শুনে মিথ্যাচার করে চাষিদের ঠকাতে চাইছে। আর জাতীয় বাজারের ক্ষেত্রে অন্যান্য রাজ্যও তো প্রতিযোগী। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র সরকার নামমাত্র দামে কৃষিতে বিদ্যুৎ দেয়, জল দেয়। স্বাভাবিক কারণে তাদের ফসলের উৎপাদনের খরচ তুলনামূলকভাবে কম। অন্যদিকে এ রাজ্যের ফসলের উৎপাদন খরচ বেশি হওয়ায় প্রতিযোগিতার বাজারে এ রাজ্য যে পিছু হটবে এতো সাধারণ অর্থনৈতিক নিয়ম। রাজ্য সরকার এই সমস্যা সমাধানে খসড়া কৃষিনীতিতে কোন পথ দেখাতে পারেনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়তে পেপসি, আই টি সি, হিন্দুস্থান লিভার, ডাবর প্রভৃতি বহুজাতিক সংস্থা উৎসাহী, রাজ্য সরকার এইসব সংস্থাকে আহবান জানাচ্ছে শিল্প গড়তে। বহুজাতিক সংস্থা খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ শিল্প গড়লে — ফসল উৎপাদনের বীজ, সার, কীটনাশক থেকে ফসলের বাজারদর সবই এই সংস্থাগুলির নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। মুখ্যমন্ত্রী যাকে 'ফাঁসকল' বলছেন, চাষিরা এই ফাঁসকলে বন্দী হবে। বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদনে মুখ্যমন্ত্রী উন্নতমানের বীজ প্রয়োগের কথা বলেছেন। এই উন্নতমানের বীজ নিয়ন্ত্রণ করে দেশী বিদেশী বহুজাতিক বীজ কোম্পানিগুলি। অন্যতম দেশী বীজ কোম্পানী শ্রীরাম বায়োসীড জেনেটিকসের সভাপতি বলেছেন — 'কৃষকরা প্রথাগত বীজের পরিবর্তে সংকর বীজের ব্যবহার করলেই একমাত্র আমাদের বাণিজ্যিক স্বার্থ পূরিত হতে পারে।' (ইকনমিক অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল উইকলি ২-১০-৯৮) মহেন্দ্র সীডসের ডাইরেক্টর কে আর চোপড়াও এ প্রসঙ্গে বলেন, 'সম্প্রতি কালে সংকর বীজের যে বাণিজ্যিক ব্যবহার আমরা করেছি তার ফলেই ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে অভাবনীয় বিকাশ সম্ভব হয়েছে' (ঐ)। কার্গিল, মনসান্তো, দুপোঁ, আই টি সি, জেনেভা ইত্যাদি বহুজাতিক পুঁজি কৃষিতে ব্যবসায়ে নামছে। রাজ্য সরকার বহুজাতিক সংস্থাকে পুঁজি খাটাতে এবং দেশজুড়ে উন্নত মানের বীজ অর্থাৎ সংকর বীজ ব্যবহার করার পক্ষে ওকালতি করছে। দেশের বীজ ভাণ্ডার থেকে ৫০ ভাগ বীজ অপসারিত করতে পারলেই বহুজাতিক বীজ ব্যবসায়ীদের মুনাফার পরিমাণ দাঁড়াবে ৬ হাজার কোটি টাকা। সম্পূর্ণ অপসারিত করতে পারলে তো কথা নেই। মুখ্যমন্ত্রী উন্নত মানের বীজ প্রয়োগ করে বেশি ফসল ফলানোর যে কথা বিকল্প কৃষিনীতিতে বলেছেন, তা তো ম্যাকিনসেরই প্রস্তাব, এটাই তো বহুজাতিক সংস্থার ফাঁসকল।

ম্যাকিনসের প্রস্তাবে চুক্তিতে চাষ করার কথা বলা হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী তা নাকচ করে বলেছেন, রাজ্যে অধিকাংশই ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, তাই বড় বড় এলাকা জুড়ে চুক্তিতে চাষ সম্ভব নয়। মুখ্যমন্ত্রীর না জানার কথা নয়, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিরা তাদের এই অল্প পরিমাণ জমি ভাল করে চাষ করতে পারে না অর্থনৈতিক সঙ্গতির অভাবে। বহুজায়গায় এই অল্প জমি চাষ না করে ইটভাটা ও ফিসারির মালিকদের কাছে টাকার বিনিময়ে লিজ দিয়ে দিচ্ছে। এর উপর কৃষি উপকরণের বিপুল দাম বৃদ্ধি, রাজ্য সরকারের বিপুল খাজনা ও সেস বৃদ্ধির চাপে ঐ চাষিরা তাদের জমি ধরে রাখতে পারবে না। যেমন গত ১০ বছরে এ রাজ্যে মধ্য ও নিম্ন কৃষকের সংখ্যা কমেছে ২ লক্ষ ৪৪ হাজার এবং এই কৃষকদের হাত থেকে ৪৭ লক্ষ ৬৩ হাজার বিঘা জমি ধনী কৃষক বা গ্রামীণ পুঁজিপতিদের হাতে চলে গেছে। (সূত্র Evaluation Programme, Evaluation wings, Directorate of Agriculture, Govt of W.B.) মুখ্যমন্ত্রী যতই তাঁদের ভূমি সংস্কার নীতির উপর ভিত্তি করে বিকল্প কৃষিনীতি প্রয়োগের কথা বলুন না কেন, বাস্তবে ক্ষুদ্র চাষি, প্রান্তিক চাষিদের কোন লাভ হবে না।

মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের এই বিকল্প কৃষিনীতি'তে কিছু বিকল্প কথা, ভাষা ও চাতুরী ছাড়া ম্যাকিনসের প্রস্তাব অনুযায়ী নিরুপম সেনের তৈরি খসড়া কৃষিনীতির সাথে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। রাজ্যের কৃষি ও কৃষককে বহুজাতিক সংস্থার 'ফাঁসকলে' ফেলে দিতে এই 'বিকল্প কৃষিনীতি' রাজ্য সরকার কার্যকর করতে চলেছে।

ইতিহাস অনুসন্ধান উদ্দেশ্য নয়

চারের পাতার পর

হীন রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করা। মুখে তারা অন্য কথা যাই বলুন, আসন্ন নির্বাচনগুলিতে 'হিন্দুত্বে'র লাইন অনুসরণ করে গুজরাটের মত গদি দখলের হীন খেলাতেই তারা মত্ত। এই প্রচেষ্টাকে আইনের মোড়ক পরিয়ে জনসাধারণের কাছে পরিবেশন করার চেষ্টা চলছে নানা কৌশলে। আমরা মনে করি, এই প্রচেষ্টা শুধুমাত্র বিজেপি'র নয়। এ প্রচেষ্টার পিছনে আসলে পুরো মদত রয়েছে শাসক পুঁজিপতিশ্রেণীর। পুঁজিবাদী শোষণ ও শাসনে অতিষ্ঠ জনসাধারণের দৃষ্টিকে সমস্যার মূল কারণ থেকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে এবং শোষিত জনগণের ঐক্যকে জাত-পাত-ধর্মবর্ণের ভিত্তিতে বিভক্ত করে দিতে শোষকশ্রেণী এই প্রচেষ্টা দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে যাচ্ছে। তাই বিজেপির 'হিন্দুত্বে'র জিগির তোলার পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে কংগ্রেস সহ অন্যান্য সরকারি দলগুলিও 'নরম হিন্দুত্বে'র লাইন নিয়ে চলতে চাইছে। রাজনীতি সচেতন সকল মানুষই জানেন, ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে আর এস এস মূলত জনসংঘ এবং সংগঠন কংগ্রেস নিয়ে নবগঠিত জনতা পার্টিকে সমর্থন করেছে। সেই আর এস এস ১৯৮০ সালের নির্বাচনে সমর্থন করেছে ইন্দিরা গান্ধীকে। ১৯৮৬-তে নির্বাচনী স্বার্থে বাবরি মসজিদের তালা খুলে রাজীব গান্ধী সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ভোট কব্জা করার যে খেলায় মেতেছিলেন সেই সুযোগকে আরও বেশি করে ব্যবহার করে বিজেপি নির্বাচনী ফয়দা তুলেছে এবং এখনও তুলে চলেছে।

আর বেদনার বিষয় হলেও একথা সত্য যে, এমনকি বামপন্থী নামধারী সি পি আই(এম), সি পি আই-ও কার্যত যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষতার পথ পরিত্যাগ করে এবং বিশেষ করে শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের পথ পরিহার করে ও ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে জনসংঘ ও অন্যান্য দক্ষিণপন্থী দলের সমন্বয়ে গঠিত জনতা পার্টিকে সমর্থন করে, '৮৯-এ ভি পি সিং-এর রাজত্বকালে বিজেপির সহযোগিতা করে, উগ্র হিন্দুত্ববাদী শক্তির উত্থানের পথকেই প্রশস্ত করতে সাহায্য করেছে। এইসব কারণে এমনকি দীর্ঘদিনের গণআন্দোলনের ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমবাংলাতেও ধর্মান্ধতার পরিবেশ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে ভাবিত করে তুলেছে। সি পি আই (এম) ফ্রন্ট সরকারও পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থে ২৬ বছর ক্ষমতাসীন থেকে শোষিত মানুষের আন্দোলনকে ধ্বংস করার যে কাজে লিপ্ত হয়েছে তার ফলে জাতপাত ধর্মবর্ণকে ভিত্তি করে — শোষিত মানুষের ঐক্যবিনষ্ট করার পুঁজিপতিশ্রেণীর অপচেষ্টায় সেও এক শরিক হয়ে উঠেছে।

দেশজুড়ে শোষকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলির বিরুদ্ধে একমাত্র গণআন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি করে শোষিত মানুষের ঐক্যকে সুদৃঢ় করতে পারলেই সাম্প্রদায়িকতার বিপদকে আমরা রুখতে পারি। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ও কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে একমাত্র এস ইউ সি আই দল রাজ্যে রাজ্যে সেই গণআন্দোলনের পতাকাকে বহন করে চলেছে। আসুন আমরা সকলে মিলে সংঘবদ্ধভাবে সেই গণআন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি করে সাম্প্রদায়িকতার শক্তিকে এবং অযোধ্যায় খননকার্য চালাবার মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার আগুনে নতুন করে ইন্ধন জোগানোর চক্রান্তকে প্রতিহত করি।

মুম্বইতে স্ট্যালিন স্মরণ দিবস পালন

মহারাষ্ট্রে এস ইউ সি আই-এর মুম্বই থানে ইউনিটের পক্ষ থেকে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড স্ট্যালিনের স্মরণ দিবসে পারেলের স্কুল অফ সোস্যাল সার্ভিস লীগ হলে ৮ মার্চ স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন কমরেড এ ত্যাগী। সভায় আলোচনা করেন কমরেডস্ কে কুলশ্রেষ্ঠ, দেবাশিস রায়, জয়রাম বিশ্বকর্মা। সভার প্রধান বক্তা কমরেড দীপঙ্কর রায় তাঁর আলোচনায় দেখান — মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আদর্শের ভিত্তিতে মহান স্ট্যালিন কিভাবে তাঁর লৌহদৃঢ় চরিত্র গড়ে তুলেছিলেন; বিভিন্ন জাতি, ভাষা, সংস্কৃতি ও আঞ্চলিকতার মধ্যে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে সমন্বয় ঘটিয়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আদর্শের ভিত্তিতে কিভাবে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নকে সফলভাবে গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি আদর্শগত নিম্নমানের জন্য মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পথ পরিহার করে পুঁজিবাদী চিন্তার পথ ধরে প্রতি বিপ্লবের রাস্তা তৈরি করে। রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির ১৯তম কংগ্রেসেই কমরেড স্ট্যালিন হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন — দলের মধ্যে আদর্শগত ও রাজনৈতিক চেতনার নিম্নমান থাকলে তা থেকে সংশোধনবাদ জন্ম নেওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

কমরেড কুলশ্রেষ্ঠ বলেন, ১৯৪২ সালে অনেক কম শক্তি নিয়ে রাশিয়া জার্মান ফ্যাসিবাদকে পরাস্ত করেছিল, কিন্তু ১৯৮৯ সালে সুপার পাওয়ার হয়েও প্রতিবিপ্লবকে সে ঠেকাতে পারলো না। এই পার্থক্য ঘটে গেল অমোঘ অস্ত্র মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রয়োগে সাফল্য ও ব্যর্থতার কারণে।

MM & PO /WB / RNP 288/2003 R. No 5268 / 60

গণদাবী ৫৫ বর্ষ / ৩৫ সংখ্যা

মহান ২৪ এপ্রিলের আহ্বান

একের পাতার পর

গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন এই দলের নেতা-কর্মীরা হবে চিন্তায়-চেতনায়-রুচিতে-সংস্কৃতিতে প্রাত্যহিক জীবনের আচরণে সর্বহারা বিপ্লবী রাজনীতির পরিপূরক। রুচি-সংস্কৃতির এই উন্নত মানই হচ্ছে বিপ্লবী রাজনীতির প্রাণসত্ত্বা, একথা তিনি বারবার বলতেন। তিনি বলতেন, একটা পার্টি সত্যই কমিউনিস্ট পার্টি কিনা বুঝতে হলে দেখতে হবে, সেই দলের নেতা ও কর্মীরা উন্নততর সংস্কৃতিগত মান প্রতিফলিত করছে কিনা। আজ একজন সাধারণ মানুষও এদেশের তথাকথিত কমিউনিস্ট পার্টিগুলির নেতা ও কর্মীদের আচরণ এবং সরকার পরিচালনা দেখে সহজেই বুঝতে পারেন তাদের রাজনীতি, শাসনপদ্ধতি ও রুচি সংস্কৃতির মান, আর যাই হোক, কমিউনিস্টের মত নয়। পাশাপাশি এস ইউ সি আই কর্মীদের উন্নত রুচিগত মান, আচার-আচরণ, নিষ্ঠা এবং জনস্বার্থে আন্দোলনে সর্বস্ব দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার স্পর্ধা এসবই সাধারণ মানুষের ভালবাসা লাভ করেছে।

বিপ্লবী দলের মূল লক্ষ্য হয়, একটির পর একটি গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে জনসাধারণের এমন রাজনৈতিক সচেতনতা ও সংঘশক্তি গড়ে তোলা যা শোষণমূলক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বিকল্প শোষিত জনগণের নিজস্ব রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দিতে পারে এবং মূল বিপ্লবী সংগ্রাম ত্বরান্বিত করতে পারে। এই বৈপ্লবিক আদর্শ ও রাজনৈতিক লক্ষ্য নিয়েই এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গেই সহ ভারতবর্ষের রাজ্যে রাজ্যে জনগণের ন্যায্য দাবি নিয়ে আন্দোলনে গড়ে তুলছে, কখনও কখনও কিছু দাবিও জনগণ আদায় করছে। সর্বোপরি এস ইউ সি আই-এর ধারাবাহিক আন্দোলন এই বার্তাই জনগণের মাঝে পৌঁছে দিতে চাইছে যে, গণআন্দোলন ছাড়া মানুষের বাঁচার পথ নেই, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ছাড়া অন্য কোন আদর্শ মানবমুক্তির পথ দেখাতে পারে না, পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া শোষণ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। এজন্য সঠিক বিপ্লবী দল ও নেতৃত্বকে জনগণের চিনতে হবে ও তাকে সর্বতোভাবে শক্তিশালী করতে হবে। এবারের ২৪ এপ্রিল নতুন করে আবার এই আহবান জানাচ্ছে।

এবারের ২৪শে এপ্রিল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক বিশেষ পরিস্থিতিতে উদ্‌যাপিত হচ্ছে। ইরাকে মার্কিন-ব্রিটিশ নগ্ন আগ্রাসন সাম্রাজ্যবাদের বর্বর চেহারা ও চরিত্র উন্মোচিত করে দিয়েছে। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের পরই এস ইউ সি আই বলেছিল, এর পরিণামে বিশ্বে শান্তির শিবির গুরুতরভাবে দুর্বল হল, বিপরীতে শক্তিশালী হল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের শিবির। ফলে দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ, আগ্রাসন ও যুদ্ধের ঘোরতর বিপদ দেখা দিল। এই পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে এস ইউ সি আই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিপদ রুখতে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ বিরোধী জঙ্গি শান্তি আন্দোলন গড়ে তোলার ডাক দিয়েছিল, যা কালক্রমে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদবিরোধী মুক্তি সংগ্রামের পরিপূরক হয়ে উঠবে। বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে এ ব্যাপারে উদ্যোগী হতে আহবান জানিয়েছিল। এবং এ পথে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে এস ইউ সি আই-এর উদ্যোগেই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৯৫ সালে কলকাতায়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত প্রতিনিধিদের সামনে এই কনভেনশন প্রতিটি দেশে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মঞ্চ ও আন্দোলন গড়ে তোলার এবং সেগুলিকে সংযোজিত করে বিশ্বব্যাপী ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন, যুদ্ধ বিরোধী জঙ্গি শান্তি আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানায়। ইরাকে মার্কিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন আমাদের দলের বিশ্লেষণ ও বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের মঞ্চ গড়ে তোলার আহবানের বাস্তবতাকেই প্রমাণ করেছে। এবার সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী যে ঐতিহাসিক গণপ্রতিবাদ দেখা গেল, তাকে সংগঠিত ও পরিচালিত করার মতো আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব ও সংগঠন থাকলে, সাম্রাজ্যবাদীদের উপর এই আন্দোলন আরও কার্যকরী চাপ সৃষ্টি করতে পারত।

মার্কিন-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা বিধ্বংসী মারণাস্ত্র ও বর্বরতার জোরে ইরাকের কিছু ভূখণ্ড দখল করলেও, তার দ্বারা ইরাকি জনগণের মনে স্বাধীনতার অনির্বান অগ্নিশিখাকে তারা নির্বাপিত করতে পারবে না। ইরাকের জনগণ স্বাধীনতার লড়াই গড়ে তুলবেই। নিজেদের দেশ থেকে ঔপনিবেশিক দখলদারদের উৎখাত করবেই। অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলনের যে জোয়ার এবার দেখা দিল, তা আদৌ ব্যর্থ হয়নি। তা দেশে দেশে জনগণকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে সরব হতে উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছে — সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনার বিস্তার ঘটিয়েছে। এই চেতনাকে ভিত্তি করেই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জঙ্গি শান্তি আন্দোলনকে সংগঠিতরূপে গড়ে তোলার দায়িত্ব নিতে হবে দেশে দেশে সর্বহারা বিপ্লবীদের। এবারের ২৪ এপ্রিল আমাদের কাছে এই আহবান নিয়ে এসেছে।

বাজার অর্থনীতি কাঠগড়ায়

পাঁচের পাতার পর

ভারতের কূটনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সামরিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। এই দাবি তারা তুলল না, তুলতে চাইল না। কারণ, সি পি এমও এটা চায় না। আমরা তাদের কেন্দ্রীয় কমিটিকে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটিকে অনুরোধ করেছিলাম যাতে যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলনের একটি কার্যকরী পদক্ষেপ হিসাবে মার্কিন-ব্রিটিশ পণ্য বয়কট করার জন্য জনগণের কাছে একযোগে আবেদন জানানো হয়, বয়কট আন্দোলনে জনগণকে উৎসাহিত করা হয়। সংবাদপত্রে তারা জানালেন, এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য ১৫ এপ্রিল তাদের পলিটব্যুরো বসবে। তারা ভেবে ভেবে এমন একটা তারিখ ঠিক করলেন, হয়ত এটা ধরে নিয়ে যে ইতিমধ্যে বাগদাদ দখল হয়ে যাবে, ১৫ এপ্রিলের পর এই কর্মসূচির আর গুরুত্ব থাকবে না। তাদের এই ভূমিকার কারণ কি? আসলে কংগ্রেস, বিজেপি, তৃণমূলের মতোই সি পি এমও আজ দেশী-বিদেশী পুঁজিকে সন্তুষ্ট রাখার পথ নিয়েছে। সেজন্য এ রাজ্যে গণআন্দোলনকে তারা ধ্বংস করছে, অন্যদিকে মার্কিন-ব্রিটিশ পণ্য বয়কটের ডাক দিয়ে তারা বিদেশী পুঁজিপতিদের অসন্তুষ্ট করতে চায় না। তাই একদিকে দলের কর্মীসমর্থক ও জনগণকে সন্তুষ্ট করার জন্য কনভেনশন ও মহামিছিলের মধ্যেই কর্মসূচি বেঁধে রাখলো। অন্যদিকে বিদেশী মার্কিন ও ব্রিটিশ পুঁজিকে সন্তুষ্ট করার জন্য বয়কট আন্দোলন এড়িয়ে গেল।

তাই দেখুন, বিশ্বব্যাপী এত আন্দোলনের জোয়ার বইছে, সেখানে ভারতবর্ষের স্থান কোথায়? একসময় ভারতবর্ষের জনগণের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গৌরবময় ঐতিহ্য ছিল, পশ্চিমবাংলার জনগণের কী বিরাট ঐতিহ্য ছিল। চীনের মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে, ভিয়েতনামের মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে, কিউবার প্রশ্নে, কঙ্গোর প্রশ্নে, দেশে দেশে বিপ্লবী আন্দোলনের সমর্থনে এখানকার ছাত্রযুবরা, বুদ্ধিজীবীরা, সাধারণ মানুষ বারবার রাস্তায় নেমেছিল, লাগাতার প্রতিবাদ ধ্বনিত করেছিল। আজ সেই সুর কোথায়, সেই প্রতিবাদ কোথায়! ইরাক ধ্বংস হচ্ছে আর আমাদের যুবশক্তি মগ্ন ক্রিকেটের বিশ্বকাপ নিয়ে। এই তো দেশের হাল! এটা কি আপনা-আপনিই হয়েছে? আমেরিকার হলিউডে অস্কার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের মঞ্চ পরিণত হয়ে গেল যুদ্ধ বিরোধী মঞ্চে। আর এই পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী ভারতীয় ক্রিকেটদলের ক্যাপ্টেনকে অভ্যর্থনা জানালেন, যুদ্ধের বিরুদ্ধে একটা কথা উচ্চারিত হল না সেই অনুষ্ঠানে। এরকম একটা বর্বর হানাদারি যে চলছে, মানুষ মরছে, ধ্বংস হচ্ছে, সেকথা যেন কারুরই মনে নেই। অস্কার অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র। এটা ঘটল এজন্যই যে বামপন্থার সেই তেজ সেই সাহস আজ নেই। বামপন্থা এখন মন্ত্রীত্বমুখী, এরই চর্চা সি পি এম নেতারা করছেন।

আজ এই সম্মেলনে দাঁড়িয়ে এটা আমাদের বুঝতে হবে, আমেরিকা অত্যাধুনিক অস্ত্র নিয়ে ইরাকের কয়েকটা শহর, কয়েকটা এলাকা দখল করতে পারে কিন্তু ইরাকের জনগণকে সে পরাস্ত করতে পারবে না। ইরাকের মানুষের মন সে জয় করতে পারবে না, স্বাধীনতার জন্য লড়াই তারা চালিয়ে যাবে। ইরাক আবার একটা ভিয়েতনাম হবে, দীর্ঘদিন এই লড়াই চলবে। অন্যদিকে একথাও ঠিক, মার্কিন-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ এখানেই থেমে থাকবে না, অন্যান্য দেশে আরও ভয়ঙ্কর আক্রমণ আসবে। সেজন্য যুদ্ধের বিরুদ্ধে আরও তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের প্রয়োজন হবে। যতদিন সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ থাকবে, যতদিন সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদকে ধ্বংস করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা না করা যাবে, ততদিন বারবার যুদ্ধ আসবে, এই ধ্বংসকাণ্ড চলবে। এজন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে বিশ্বব্যাপী প্রবল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলায় আমাদের ভূমিকা পালন করার জন্য। আবার এই ভারতের, আবার এই পশ্চিমবাংলার সংগ্রামী যৌবনকে জাগাতে হবে, সেজন্য আমাদের ভূমিকা পালন করতে হবে।

মার্কিন-ব্রিটিশ পণ্য বয়কটের যে আহবান রাখা হয়েছে, তা প্রতীকী। প্রতিটি মানুষ তার প্রতিবাদকে ব্যক্ত করবেন মার্কিন-ব্রিটিশ পণ্য বয়কট করার মধ্য দিয়ে। এই বয়কটকে শক্তিশালী করুন, ব্যাপকতর করুন, আরও বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতি নিন — এটাই আমার আবেদন।

পুরুলিয়ায় ডি এস ও'র যুদ্ধ বিরোধী বিক্ষোভ

পুরুলিয়া জেলা ডি এস ও'র উদ্যোগে ইরাকের উপর ইঙ্গ-মার্কিন আক্রমণের প্রতিবাদে ২৫ মার্চ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও ছাত্র-ছাত্রীরা সমবেত হয়ে স্লোগান দিয়ে পথ পরিক্রমা করে এবং পুরুলিয়া স্টেশনে অত্যাচারী বুশের কুশপুতুল দাহ করা হয়।

২৭ মার্চ পালিত হয় এক অভিনব কর্মসূচি। ইরাক সহ গোটা বিশ্বজুড়ে গণহত্যা চালানোর প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলি প্রেসিডেন্ট বুশের প্রতীকী মৃত্যুদণ্ড দেয় কলেজগুলির গেটে। ডি এস ও'র উদ্যোগেই এই কর্মসূচি পালিত হয়। অন্যান্য সংগঠন এবং সাধারণ ছাত্ররা এই কর্মসূচিতে যুক্ত হন। জেলা কমিটির সদস্য কমরেড সুস্মিতা মাহাত, জে. কে. কলেজ ও নিস্তারিণী কলেজের প্রতিবাদ সভায় কমরেড সাবিত্রী মাহাত যথাক্রমে ডি এস ও'র পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন। অন্যান্য সংগঠনের নেতৃবৃন্দও কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন।

যুদ্ধে মন্দা কাটার লক্ষণ নেই

ছয়ের পাতার পর

ওপর পুরোপুরি মার্কিন নিয়ন্ত্রণ তারা চায়না। এর ওপর ছিল যুদ্ধ বিরোধী তীব্র জনমতের চাপ। বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে গোটা দুনিয়ার মানুষই এবার পথে নেমে বুশ ব্লেয়ারকে যুদ্ধাপরাধী বলে চিহ্নিত করেছেন। বিশ্বায়ন, গণতন্ত্রীকরণের মিষ্টি কথার আড়ালে ঢেকে রাখা সাম্রাজ্যবাদের পররাজ্যলোভী বর্বরতা নগ্নভাবে বেরিয়ে এসেছে। এই যুদ্ধ দেশে দেশে জনগণের চোখ খুলে দিয়েছে। এদিক থেকে ইরাকের জনগণের বিরাট রক্তস্রোত ব্যর্থ হয়নি। দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চক্রান্তের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনগুলিকে সংগঠিত রূপ দেওয়ার জন্য প্রতিটি দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মঞ্চ গড়ে তুলতে হবে এবং সেগুলিকে সংযোজিত করে বিশ্বব্যাপী সংগঠিত লড়াইয়ে পরিণত করতে হবে। ১৯৯৫ সালে এস ইউ সি আই-এর উদ্যোগে কলকাতায় বিদেশী প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সম্মেলনের মঞ্চ থেকে এই আহবানই রাখা হয়েছে। যুদ্ধের বিরুদ্ধে লাখ লাখ মানুষের সমাবেশ একটা বিরাট শক্তি, এর সঙ্গে চাই সঠিক রাজনীতি, সঠিক নেতৃত্ব। যা হলে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদকে খতম করে চিরতরে যুদ্ধের অবসান ঘটানো যাবে।

২৪ এপ্রিল

এস ইউ সি আই প্রতিষ্ঠা দিবসে

কলকাতা জেলা কমিটির আহ্বানে

সমাবেশ

ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হল বিকাল ৫টা

বক্তা ঃ কমরেড প্রভাস ঘোষ

সভাপতি ঃ কমরেড কালিকা মুখার্জী

সম্পাদক আশুতোষ ব্যানার্জী কর্তৃক ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত।

ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৪৪-০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net